ISSN2415-6639

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট পত্রিকা

Bangladesh Cinema and Television Institute Journal

সংখ্যা ৮ | বর্ষ ৫ ভলিউম ১ | পৌষ ১৪২৫
Issue 8 | Year 5 Volume 1 | Dec. 2018

৮

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট পত্রিকা

Bangladesh Cinema and Television Institute Journal

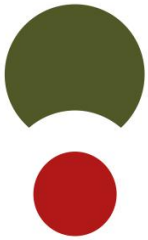

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট পত্রিকা

Bangladesh Cinema and Television Institute Journal

ISSN 2415-6639

সংখ্যা ৮	বর্ষ ৫ ভলিউম ১	পৌষ ১৪২৫
Issue 8	Year 5 Volume 1	Dec. 2018

সম্পাদক
মোহাম্মদ আজহারুল হক

নির্বাহী সম্পাদক
মইনুদ্দীন খালেদ

সম্পাদনা পরিষদ
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
মোঃ মারুফ নাওয়াজ
অনুপম হায়াৎ
মোঃ মাহমুদুন নবী
মোঃ মাসুম-উল-আলম

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট পত্রিকা
Bangladesh Cinema and Television Institute Journal

সংখ্যা ৮	বর্ষ ৫ ভলিউম ১	পৌষ ১৪২৫
Issue 8	Year 5 Volume 1	Dec. 2018

সম্পাদক: মোহাম্মদ আজহারুল হক
Editor: Mohammad Azharul Haque

প্রকাশক: প্রধান নির্বাহী, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট
তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা

প্রচ্ছদ: মোস্তাফিজ কারিগর

কম্পিউটার কম্পোজ: মোঃ রাশেদুল ইসলাম

মুদ্রণ: গ্রাফিক্স মিডিয়া, ৮৫/১ ফকিরের পুল, ঢাকা-১০০০

মূল্য: একশত টাকা

Price: One Hundred Taka

পরিবেশক
প্যাপিরাস, আজিজ সুপার মার্কেট, ঢাকা
পাঠক সমাবেশ, আজিজ সুপার মার্কেট, ঢাকা
প্রকৃতি, কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা

যোগাযোগ
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট
১২৫/এ দারুস সালাম, এ. ডব্লিউ. চৌধুরী রোড, ঢাকা- ১২১৬
ফোন: +৮৮ ০২ ৫৫০৭৯৩৪০, ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৫৫ ০৭ ৯৩ ৪৫
ই-মেইল: bctibd2013@gmail.com, ওয়েবসাইট: www.bcti.gov.bd

Contact
Bangladesh Cinema and Television Institute
125/A Darus Salam, A.W. Chowdhury Road, Dhaka- 1216
Phone: +88 02 55079340, Fax: +88 02 55 07 93 45
E-mail: bctibd2013@gmail.com, Website: www.bcti.gov.bd

সম্পাদকীয়

ডিজিটাল প্রযুক্তির দুর্নিবার অগ্রযাত্রায় বিশ্বের মানুষ এখন একই গ্লোবাল ভিলেজের বাসিন্দা। কানে শোনা আর চোখে দেখার যন্ত্র আজ সবার হাতে। স্মার্ট ফোনের বদৌলতে ঘুচে গেছে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-বিভঞ্জন মানুষে মানুষে সম্পর্ক হয়েছে ঘনিষ্ঠতর। জীবন-জগতের বস্তুনিষ্ঠতা আর সত্যনিষ্ঠতা এখন চোখের সামনে দৃশ্যমান।

বিগত এক যুগ যাবৎ বাংলাদেশে ডিজিটাল প্রযুক্তির ঈর্ষণীয় উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। প্রযুক্তির এই বিপুল উৎকর্ষের ফলে জীবন-যাত্রার পালাবদল ঘটছে দ্রুত লয়ে। মানুষের চিন্তন-প্রক্রিয়ায় চলছে নানা আবর্তন সময়কে ধারণ করার জন্য। তথ্য-তৃষ্ণা, বিনোদন-বাসনা, জীবনের আশা-নিরাশার নানা শৈল্পিক নির্মাণ ও সর্বোপরি সময়ের নানাবিধ ভাষ্য ও ব্যাখ্যা খুঁজতে হচ্ছে দৃশ্যমাধ্যমে নিবেদিত সৃজনশীল মানুষদের। সময়ের প্রাজ্ঞ ও শৈল্পিক বিশ্লেষণের অন্যতম মুখপাত্র 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট পত্রিকা'। এ সাময়িকীর ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত হল দৃশ্যাত্মক মাধ্যমের নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণী লেখার পাশাপাশি হাল আমলের তথ্যসম্বলিত প্রযুক্তি বিষয়ক প্রবন্ধ-নিবন্ধ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ থেকে ৭৫ পর্যন্ত কালখণ্ডে নির্মিত চলচ্চিত্রে কিভাবে চলচ্চিত্রায়িত হয়েছেন তার পরিচয় রয়েছে শুভ কর্মকারের লেখায়।

ফরিদুর রহমান বৈঠকী ঢঙে বয়ান করেছেন চলচ্চিত্র ও সাহিত্যের সম্পর্কসূত্র আর ড. সেলিম মোজাহারের 'চিত্রনাট্য রচনা : চরিত্র নির্মাণ" শীর্ষক প্রবন্ধটি একই সঙ্গে সাধারণ আগ্রহী পাঠক ও একাডেমিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের কৌতূহল ও প্রয়োজন মেটাবে। চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত নারীর ইমজ ও মনোলোক বিষয়ে যাহরিন নাজাহ ও পরমা সোমের প্রবন্ধ দুটিও কালোপযোগী। কৌশিক গাঙ্গুলির 'শব্দ' চলচ্চিত্র নিয়ে বিশদ বিশ্লেষণে গিয়েছেন ড. সাজেদুল আউয়াল। ডিজিটাল প্রযুক্তি

বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য অবশ্যপাঠ্য দুটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন পঙ্কজ পালিত ও মুহাম্মদ ফেরদৌস আলম সিদ্দিকী। এ ছাড়া বাংলাদেশের তিন কীর্তিমান মিডিয়া ব্যক্তিত্বকে স্মরণের আলোয় মূল্যায়ন করা হয়েছে। হুমায়ুন আহমেদকে নিয়ে নওয়াজীশ আলী খান, আলমগীর করীরকে নিয়ে অনুপম হায়াৎ আর বেলায়েত হোসেন মামুন লিখেছেন বাদল রহমানের জীবন ও অর্জন বিষয়ে।

অনেকের নানাবিধ সহযোগিতায় সম্ভব হল এ সংখ্যার প্রকাশ। তথ্য মন্ত্রণালয় ও বিসিটিআই-এর পরিচালনা পরিষদের সম্মানীয় সদস্যবর্গ, লেখক, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও সকল শুভানুধ্যায়ীকে পত্রিকার ৮ম সংখ্যা প্রকাশ লগ্নে সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে জানাই কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

মোহাম্মদ আজহারুল হক

ডিসেম্বর, ২০১৮।

সূ চি প ত্র

চিত্রনাট্য রচনা : চরিত্রনির্মাণ ০৯
ড. সেলিম মোজাহার

ছবিতে কথোপকথন ২৫
ফরিদুর রহমান

সিগন্যাল এবং অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে সিগন্যালের ব্যবহার ৩৫
পঙ্কজ পালিত

ডিজিটাল ভিডিওর কারিগরি দিক ৪৫
মুহাম্মদ ফেরদৌস আলম সিদ্দিকী

ইলেকট্রনিক মিডিয়া : অজানা অধ্যায় ৬৫
মাহমুদ হাফিজ

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রে (১৯৭২-৭৫)
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থাপন ৭৩
শুভ কর্মকার

চোখের বালি : রবীন্দ্র চলচ্চিত্রে নারী ৮৯
যাহরিন নাজাহ

বাংলাদেশের সমসাময়িক চলচ্চিত্রের গান : নারীর নতুন পরিচয় 'আইটেম' ১০১
পরমা সোম

প্রথম পরিচয়, অতঃপর ১১৫
নওয়াজীশ আলী খান

চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ ইতিহাসবিদ লেখক আলমগীর কবির ১২৫
অনুপম হায়াৎ

চলচ্চিত্রকার বাদল রহমান : সময়ের অফুরান প্রাণ ১৩৫
বেলায়াত হোসেন মামুন

কৌশিক গাঙ্গুলীর 'শব্দ' : আখ্যান রচনার কৌশল বিচার ১৫৩
ড. সাজেদুল আউয়াল

ছিটকিনি : নারী মনস্তত্ত্বের চালচ্চিত্রিক উপস্থাপন ১৭৯
সাইয়্যিদ শাহজাদা আল কারীম

লেখা পাঠানো সংক্রান্ত তথ্য ১৯৭

চিত্রনাট্য রচনা : চরিত্রনির্মাণ

ড. সেলিম মোজাহার

সারসংক্ষেপ

[সিনেমার জন্য লিখিত 'গল্প' বা 'চিত্রনাট্য' মহাকাব্য, গল্প, উপন্যাস, কবিতা ইত্যাদির মতোই বর্ণনাধর্মী, সৃজনশীল কাজ। কিন্তু, 'চিত্রনাট্য' চূড়ান্ত কোনো শিল্পকর্ম নয়; যেমন নয় মঞ্চের জন্য লিখিত 'নাটক' বা 'নাটলিপি'ও। নাটক বা নাটলিপি অবশ্য সৃজনশীল সাহিত্য প্রতিবেদন হিসেবেও স্বীকৃত-গৃহীত। চিত্রনাট্যের সে গ্রাহ্যতা এখনো তৈরি হয়নি। এটি তাই এখনো সম্ভাব্য শিল্পকর্মের পূর্বলেখ বা নীলনকশামাত্র; যার নির্দেশনা অনুসরণ করে একজন চিত্রপরিচালক 'চলচ্চিত্র' নামের একটি শিল্পকর্ম বা শিল্পবস্তু রচনা করবেন। তবু বিশেষত বর্ণনাধর্মী চরিত্রনির্ভর কাহিনি চলচ্চিত্রে, যেখানে একটি 'নিটোল' গল্প বলাই চিত্রনির্মাতার প্রাথমিক লক্ষ্য, সেখানে চিত্রনাট্যকারের কাজটাই প্রধান, প্রাথমিক ও মৌলিক। এমন বিবেচনা চলচ্চিত্রবিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ্যক্রমে গুরুত্বের সাথে গৃহীত। গত শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে পশ্চিমা 'বিগ ইন্ডাস্ট্রি'র চাহিদার সমান্তরালে গড়ে ওঠা 'চলচ্চিত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'গুলোতে [ফিল্ম স্কুল] 'স্ক্রিন রাইটিং' বা 'চিত্রনাট্য লিখন' স্বতন্ত্র, সৃজনশীল, মৌলিক ও পেশাদারি পাঠ হিসেবে অনুশীলিত। এ-বিষয়ক সন্দর্ভ, পাঠ, নির্দেশিকা, সূত্র ও ধারণা ইতিমধ্যে রীতিমতো প্রাতিষ্ঠানিকতা পেয়ে গেছে। বাংলাদেশেও সম্প্রতি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে 'চলচ্চিত্র অধ্যয়ন ও নির্মাণ'বিষয়ক পাঠানুশীলন শুরু হয়েছে। পরিপ্রেক্ষিতটি বিবেচনায় রেখে বর্তমান সন্দর্ভে চিত্রনাট্যের অন্যতম মৌলিক উপাদান 'চরিত্রনির্মাণ'বিষয়ক কিছু ধারণা-কাঠামোর মুখোমুখি হব আমরা।]

ধরে নিতে আগ্রহ বোধ করি যে 'চিত্রনাট্য রচনা' একটি মৌলিক সৃজনশীল কাজ। আর সৃজনশীলতাকে সুপ্রাচীন কাল থেকেই কেবলই প্রতিভাবান ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ বা ঝোঁকের ব্যাপার বলে মানা হয়নি। মানা হয়েছে, যেকোনো সৃজনশীল কাজ তথা 'শিল্পবস্তু' একটি 'নির্মাণ' এবং তা দক্ষতা ও কৌশলনির্ভর। এ দক্ষতা অর্জন করতে হলে শিল্পীকে অবিরাম অনুশীলনের ভেতর দিয়ে যাবার পরামর্শ পাওয়া গেছে হাজার হাজার বছর আগেকার শিল্পতাত্ত্বিকদের কাছ থেকে।[১] মানা হয়েছে, মাধ্যমের বিভিন্নতা ভেদে যেকোনো শিল্পবস্তু নির্মাণের রয়েছে নিজস্ব

কৌশলাদি। শিল্পীকে তার মাধ্যমের মৌলিক উপাদানগুলোকে পরিষ্কারভাবে চিনতে-বুঝতে হয়, সেগুলোকে আয়ত্তে পেতে হয় এবং ঠিক জায়গায় ঠিক কৌশলে ব্যবহার করতে হয়।

মূল চিন্তা [থিম] বিষয় [সাবজেক্ট], গল্প [স্টোরি], সংলাপ [ডায়ালগ], দৃশ্য [সিন ডেসক্রিপশন], পরিচর্যা [ট্রিটমেন্ট] ইত্যাদির মতো চিত্রনাট্য লিখনের অন্যতম মৌলিক উপাদান হলো 'চরিত্রনির্মাণ'। বিশেষত বর্ণনাধর্মী আখ্যানমূলক চলচ্চিত্রে 'চরিত্র'ই সবচেয়ে জরুরি উপাদান, যার বা যাদের ক্রিয়াত্মক উপস্থিতি বা তৎপরতায় কাহিনি চলচ্চিত্রের গল্প বিকশিত হয়। অথবা যাদের উপলক্ষ করে, কেন্দ্র করে, আবর্তিত হয়ে একটা গল্প সূচিত হয়, এগোয়, দানা বাঁধে, পরিণতি পায়; যাদের ক্রিয়াত্মক তৎপরতায় চিত্রনাট্যকারের গল্প গন্তব্য খুঁজে পায়। চরিত্র 'ফুটে না উঠলে' গল্পকথকের লক্ষ্য ও পরিশ্রম ব্যর্থ হয়।

চিত্রনাট্যে এ চরিত্রকে 'ফুটিয়ে তোলা'র ব্যাপারটা আসলে কী? 'কাব্যতত্ত্ব'র প্রণেতা অ্যারিস্টটল মনে করেন, নাট্যের চরিত্রগুলোকে সুসঙ্গত হতে হবে। সুসঙ্গতির মানে হলো চরিত্রগুলো যথাযথ ও বাস্তবভাবে চিত্রিত হওয়া। এ ক্ষেত্রে যদি কোনো অবাস্তব-উদ্ভট চরিত্রকে নাট্যে দেখাতে হয় তাহলে কী উপায় ? ধ্রুপদী কাব্যতাত্ত্বিক মনে করেন, অবাস্তবতা ও অসংলগ্নতাও গল্পে বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে, যদি তাকে যৌক্তিকভাবে দেখানো যায়। তিনি এর নাম দিয়েছেন অসংগতির সংগতিবিধান। অ্যারিস্টটলের মতানুযায়ী তাই চরিত্রের ফুটে ওঠা নির্ভর করে চরিত্রগুলোকে যৌক্তিকভাবে রূপ দেবার ওপর। অবস্থা, অবস্থান, শ্রেণি, শিক্ষা, পেশা, লিঙ্গ, আচার, ইচ্ছা, রুচিবাচন ইত্যাদি আরও অসংখ্য সূচকে সামাজিক মানুষেরা চিন্তা ও আচরণে বিচিত্র-বিভিন্ন হয়। এ বিভিন্নতার রূপ ও কারণ আবিষ্কার করতে পারলে, জানতে-বুঝতে পারলে, নাট্যলেখক তার চরিত্রগুলোকে যৌক্তিক বাস্তবতায় রূপ দিতে পারবেন।

অ্যারিস্টটলের চরিত্র তখন তিনটি প্রধান গুণে ঘনত্ব পাবে : বাস্তবতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও যৌক্তিকতা।

অ্যারিস্টটল নাট্যের ক্ষেত্রে চরিত্রকে অবশ্য দ্বিতীয় প্রধান উপাদান মনে করেছেন। তাঁর কাছে যৌক্তিকভাবেই প্রথম গুরুত্বের ছিল গল্প বা আখ্যান বা কাহিনিবৃত্ত, যাকে ছাড়া চরিত্রের অস্তিত্বই নেই। তাঁর মতে যেকোনো শিল্পই অনুকরণ। নাট্যও অনুকরণ এবং তা নাট্য হলো দেখন [ভিজ্যুয়াল] মাধ্যমের অনুকরণ। এ অনুকরণের প্রাণ চরিত্রসমূহের ক্রিয়াশীলতা [অ্যাকশন]। যথাযথ, বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য। চরিত্রের সংগত ক্রিয়াশীলতা [অ্যাকশন] নাট্যকার ও নাটকের লক্ষ্যকে গন্তব্যে নিয়ে যায়। দৃশ্যমাধ্যমের [নাট্য] গল্প লেখকের তাই দায় হচ্ছে, চরিত্র ও চরিত্রের

ক্রিয়াশীলতাকে যৌক্তিকভাবে বোঝা। এ বোঝাপড়ায় পৌঁছানোর একটাই উপায় : বিচিত্র সামাজিক মানুষকে অবিরাম পর্যবেক্ষণ।

নাট্যলেখকদের প্রতি অ্যারিস্টটলের পরামর্শমালা আধুনিক নাট্যলেখক এবং চিত্রনাট্য লেখকদের জন্য এখনো সমানভাবে জরুরি মানা হয়। অ্যারিস্টটলের এ পর্যবেক্ষণ তত্ত্বের বাইরে মানবচরিত্রকে বোঝাপড়ার আর কোনো প্রতিষ্ঠিত সূত্র-পদ্ধতি আছে কি? যে সূত্র-পদ্ধতি অনুসরণ করে গল্পের চরিত্রগুলোকে গড়ে নিলে, চরিত্রগুলো অসংগত, অবাস্তব ও অযৌক্তিক মনে হবে না?

মানবপ্রকৃতি, মানবসত্তা, মানবচরিত্র ও মানববৈশিষ্ট্য নিয়ে মানুষের জানার চেষ্টা আধুনিক 'অনটোলজি' কালের ঘটনা নয়। ভারতীয় দর্শনে বেদ মানা সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত–এই ছয়টি আস্তিক্যবাদী এবং বেদ না মানা জৈন-বৌদ্ধ-চার্বাক–এ তিনটি বস্তুবাদী, নাস্তিক্যদর্শনের জীবন ও বিশ্ব-সাধনায় প্রাণ, প্রাণের উৎস, সত্তা, ব্যক্তি, ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা, জ্ঞান, জ্ঞানের উৎস, মন ও আত্মা, দেহ-মন সম্পর্ক, মানব ও মানব-অস্তিত্ব, মানব-কর্তব্য ইত্যাদি মানবতাত্ত্বিক মৌলিক প্রশ্নগুলো নিয়ে গভীর সূত্রবদ্ধ বিশ্লেষণের ঐতিহ্য আছে। এ ঐতিহ্য সাড়ে তিন হাজার বছরের পুরোনো। এর ১ হাজার বছর পরের পশ্চিমা [প্রাক্-সক্রেটিস] প্রকৃতিবাদী দার্শনিক-বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানসম্মত, ইহজাগতিক, মানবসন্ধানের কথাও আমাদের জানা। কাজেই ধরে নিতে পারি, মানবচরিত্র অনুধ্যান কেবল গল্পলেখকদের বা চিত্রনাট্য লেখকদের হাল-আমলীয় মাথাযন্ত্রণার বিষয় নয়। মানুষকে জানা-বোঝার; মানুষের আকার-প্রকার, রূপ-প্রকৃতি, স্বভাব-কর্ম, এষণা-তাড়না, উদ্দেশ্য-গন্তব্য বিষয়ে বোঝাপড়ার চেষ্টা প্রাতিষ্ঠানিকতা পেয়েছে সুদূর কালে। শাস্ত্রীয়, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সেসব মানবসন্ধান বিস্তৃত হয়েছে আধুনিক মানববিজ্ঞানে।

মানবতত্ত্ব-বিষয়ক মানুষের সূত্রবদ্ধ অভিজ্ঞতার ঐতিহ্য ১২ হাজার বছরেরও আগের কথা। প্রাচীন ইহুদি ঐতিহ্যের 'কাব্বালাহ'–যাতে মৌখিক ঐতিহ্য পরম্পরায় সূত্রবদ্ধ হয়েছে ক্ষয়িষ্ণু মানবজীবন ও শাশ্বত মহালোকের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবন, অস্তিত্ব, কর্মকর্তব্য, রূপাচার-বিষয়ক ভুয়োজ্ঞান [জীবনাভিজ্ঞতালব্ধ]। কাব্বালাহ মানবীয় অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার একটি পথ, যা পরবর্তী কালে, সোফি বা সুফি-সাধকদের জীবন ও মানবচিন্তাকে বিকশিত করেছে। ইহুদি কাব্বালাহ খ্রিষ্টীয় জাগরণের সূত্র ধরে আরও নানা শাখা-প্রশাখায় চর্চিত হয়ে চলেছে আজও। কাব্বালাহ-চিত্রিত মানববৈশিষ্ট্য তথা 'ইনিয়াগ্রাম'[৩] আধুনিক আচরণবিজ্ঞানীদের চর্চা-গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। মনোবিজ্ঞানী অসকার ইসাজো [১৯৩১] এবং ক্লডিও নারানজো [১৯৩২] ইনিয়াগ্রাম পারসোনালিটি

টাইপ বা ব্যক্তিনমুনাকে কাঠামোবদ্ধ করেন :

ইনিয়াগ্রাম পারসোনালিটি টাইপ

ধাপ	জাত	বিশ্বচেতনা	অবচেতন	বিশেষ গুণ
১	শুদ্ধবাদী [দ্য পারফেকশনিস্ট]	জীবন হলো ভুলে শুধরে চলা এবং সফল হওয়ার জন্য লড়াই করা	চাপা রাগ । সবকিছুর প্রতি অসন্তুষ্ট, বিরক্ত	সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধিপ্রবণ
২	সাহায্যকারী [দ্য হেল্পফুল]	[আমার] ভালোবাসা পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রেখেছে।	চাপা গরিমা	সহানুভূতিশীল
৩	উদ্যোগী [দ্য পারফরমার]	জীবন হলো কীর্তি রেখে যাওয়া	আত্মশঠতা	পারঙ্গম, অভিযোজক
৪	স্বাপ্নিক [দ্য রোমান্টিক]	গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা হারিয়ে যাচ্ছে; ওটা না পেলে এ জীবন অপূর্ণ	ঈর্ষাপ্রবণ	অনন্যতাপ্রিয়
৫	পর্যবেক্ষক [দ্য অবজারভার]	জ্ঞান আমাকে নিরাপদ রাখবে	অলস প্রকৃতির	নিঃসঙ্গতাপ্রবণ
৬	বিশ্বস্ত [দ্য লয়াল]	পৃথিবীটা ভয়ংকর জায়গা। সবাই গোপন অ্যাজেন্ডা নিয়ে ঘুরছে	সন্দেহবাদী, সংশয়ী। কখনো বিতৃষ্ণ, কখনো সহনশীল	প্রতিশ্রুতিবান, সুশৃঙ্খল
৭	সুখবাদী [দ্য এপিকিউর]	জীবন এক অন্তহীন সম্ভাবনার জায়গা	ভোজনপ্রিয়	আশাবাদী
৮	কর্তা [দ্য বস]	কেবল ক্ষমতাবানরাই টিকে থাকে	বাসনাপ্রবণ	শক্তপোক্ত
৯	মধ্যস্থতাকারী [দ্য মিডিয়েটর]	জীবন হলো সুরের তারে ভেসে চলা	ধীর ও আত্মভোলা স্বভাবের	গ্রহণযোগ্য

চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক কথিত প্রাক্-সক্রেটিস প্রকৃতিবাদী দার্শনিক হিপোক্রিটাস [কস, গ্রিকদ্বীপ : ৪৬০-৩৭০ খ্রি.পূ.]। আধুনিক পশ্চিমা দর্শনে-বিজ্ঞানে তাকে শারীরিক বস্তুবাদের আদি দ্রষ্টা বলে মানা হয়। তিনি প্রস্তাব করেন : মানুষের শরীর, স্বাস্থ্য, স্বভাব, আচরণ তার দেহ-নিঃসরিত চার ধরনের রস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ চারটি রসের ভারসাম্যের মধ্যে মানুষের স্বাস্থ্য নিহিত। এ চারটি রসের ভারসাম্যহীনতায় মানুষ স্বাস্থ্যহীন, জরাগ্রস্ত হয়। রসগুলো হলো : রক্ত, শ্লেষ্মা, কালো পিত্ত আর হলুদ পিত্ত। বহু বছর ধরে পশ্চিমা চিকিৎসাবিজ্ঞানে এটি একটি সার ধারণা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ তত্ত্বকে গ্রিক চিকিৎসাবিজ্ঞানী গালেন [পারগেমন, গ্রিস : ১২৯-২১০ খ্রি.] 'ফোর হিপোক্রেটিক হিউমার' হিসেবে কাঠামোবদ্ধ করেন।

হিপোক্রেটিক হিউমার অনুযায়ী, শরীরের রক্তরসের সাথে মানুষের আনন্দ, উৎসাহ, প্রেরণা, উদ্যম, উদ্যোগ ইত্যাদি গুণ সম্পর্কিত। শরীরে বিশুদ্ধ রক্তরসের স্বাভাবিক প্রবাহ মানুষের চরিত্রে উপরোক্ত গুণগুলোর প্রভাব তৈরি করবে। শরীরে বিশুদ্ধ

রক্তরসের স্বাভাবিক প্রবাহ না থাকলে উপরোক্ত গুণগুলোতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এ তত্ত্বানুযায়ী, শরীরে শ্লেষ্মারসের আধিক্য মানুষকে জরা-কাশিগ্রস্ত, মন্থর, বিমর্ষ ও উদাসীন করবে। আর শরীরে হলুদ পিত্তের অধিক নিঃসরণ মানুষকে মেজাজি, বদরাগী ও অস্থিরমতি করবে। শরীরে কালো পিত্তের প্রাবল্য মানুষকে করবে দুঃখী, বিমর্ষ ও হতাশ।[৪] আধুনিক পশ্চিমা আচরণ বিজ্ঞানের 'ম্যাড-স্যাড-গ্ল্যাড-স্কেয়ার্ড' ধরনের চতুর্মাত্রিক আচরণ-কাঠামোয় [ক্যারেক্টার প্যারাডাইম] হিপোক্রেটিক আচরণ-কাঠামোটির সমন্বিত পাঠ মানবচরিত্র পাঠকদের জন্য অনুসন্ধানী উৎস হতে পারে।

মানবচরিত্রকে কতগুলো মৌলিক বৈশিষ্ট্যে ভাগ করা একটি 'পারসোনালিটি সোমাটাইপ' পাই আচরণবিজ্ঞানী ইয়ুঙের কাছ থেকে। এটি আচরণতত্ত্বে বিজ্ঞানসম্মত মডেল বলে বিবেচিত হয়। মানুষের প্রবণতাকে তার স্বভাববৈশিষ্ট্য, ক্রিয়াশীলতা, এষণা-আগ্রহ, চেতন-অবচেতন ইত্যাদির ভিত্তিতে ইয়ুঙ প্রথমত ও প্রধানত দুভাগে ভাগ করেছেন। এরা হলো অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখী। এ দুটি প্রধান প্রবণতার মানুষদের আবার চার-চার ভাগে ভাগ করেছেন। এ হিসাবে ইয়ুঙের মানুষেরা ৮ ধরনের হয় স্বভাবত। এরা হলো : অন্তর্মুখী স্পর্শকাতর [সেনসিটিভ], অন্তর্মুখী স্বজ্ঞাবান [ইনটুইটিভ], অন্তর্মুখী অনুভূতিপ্রবণ [ফিলিংফুল] ও অন্তর্মুখী চিন্তাশীল [থটফুল] এবং বহির্মুখী স্পর্শকাতর, বহির্মুখী স্বজ্ঞাবান, বহির্মুখী অনুভূতিপ্রবণ ও বহির্মুখী চিন্তাশীল। ৮-ধাপ মানববৈশিষ্ট্যকে ইয়ুঙ এভাবে কাঠামোবদ্ধ করেন:

বহির্মুখী	
বৈশিষ্ট্য-নাম	বৈশিষ্ট্য-সমাচার
বহির্মুখী সংবেদনশীল	বাস্তববাদী, স্বচ্ছন্দ, সহনশীল ও ধৈর্যশীল। কখনো কখনো বড় রকমের ভুল করে বসে। সবকিছুর খুঁটিনাটি আয়ত্ত করে নিতে পারে। প্রতিটি মুহূর্তকেই যাপন করতে চায়। খাবারদাবার, খেলাধুলা, সংগীত ও শিল্পকলা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য; যন্ত্রবিজ্ঞান, চারুকারুকলা, গৃহবিন্যাস ও রান্নাবান্না ইত্যাদিতে এদের অনুরাগ। এবং সেসব কাজ, যেগুলোতে অনুপুঙ্খ মনোযোগের দরকার হয়।
বহির্মুখী স্বজ্ঞাবান	স্বতঃস্ফূর্ত, উদ্ভাবক, উদ্যোগী, একগুঁয়ে, বহুমুখী, স্বচ্ছন্দ, সহনশীল, ধৈর্যশীল ও নমনীয়। যেকোনো পরিস্থিতির বাস্তব সম্ভাবনা খুঁজে নিতে পারে। পরিস্থিতির ওপর চোখ রাখতে জানে। জটিলতা বা জটিল পরিস্থিতি উপভোগ করে। নিজেকে নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে পারে। কোনো নতুন বিষয়ে সহজে দক্ষতা অর্জন করতে পারে।
বহির্মুখী অনুভূতিপ্রবণ	কৌশলী, গণতান্ত্রিক, সংগতিপূর্ণ, উষ্ণ, বন্ধুপ্রিয়, আনন্দ-উদ্দীপনাময়, সংবেদনশীল ও সহানুভূতিশীল। বন্ধুত্বের মর্যাদা দিতে জানে। অন্যের প্রয়োজন মেটাতে উন্মুখ। সামাজিক মূল্যবোধ ও সদাচার এদের কাছে মূল্যবান। ভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। মনের কথা সহজে প্রকাশ করতে পারে। অন্যের পছন্দ-অপছন্দের প্রতি সজাগ।
বহির্মুখী চিন্তাশীল	আইনানুগ, লক্ষ্যাভিমুখী, নীতি-নিয়ম মানা ও আদর্শবাদী। আবেগ নয়, যুক্তি দ্বারা চালিত। সবকিছুকে যুক্তিসম্মতভাবে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারে। সর্বজনীন ধারণা ও বিধিবিধানের ভিত্তি করে এরা সিদ্ধান্ত নেয়। নৈর্ব্যক্তিক, নিরপেক্ষ জায়গা থেকে মানুষের প্রতি [ন্যায্য] ব্যবহার। জগৎ-জীবনের মানে খুঁজে বেড়ানো। যত কম সম্ভব সময় ও শক্তি খরচ করে কাজ শেষ করা এবং পরিকল্পনা এগিয়ে নেওয়া।

অন্তর্মুখী	
বৈশিষ্ট্য-নাম	বৈশিষ্ট্য-সমাচার
অন্তর্মুখী সংবেদনশীল	নিয়মানুবর্তী, লক্ষ্যাভিমুখী ও রক্ষণশীল। শরীরের সংবেদনশীলতা বিষয়ে শারীরিক-মানসিকভাবে সজাগ। ভালো স্মরণশক্তির অধিকারী। বাস্তবতা বিষয়ে নিজের মনোগত ধারণায় একগুঁয়ে থাকে–যা অন্যদের কাছে রীতিমতো উদ্ভট। গভীর নান্দনিক বোধ। বিমূর্তকলায় আগ্রহী।
অন্তর্মুখী স্বজ্ঞাবান	সৃজনশীল। নিজের মনছবি দ্বারা পরিচালিত হয়। ভেতরে ভেতরে উদ্ভট কল্পনাপ্রবণ। জটিল পরিস্থিতিতে অন্তর্দৃষ্টি খোলে এদের। সৃজনশীল উদ্ভাবনী ক্ষমতা আছে। কোনো একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণে আটকে থাকে না। কারো সাথে সম্পর্ক গড়ায় নিজের অন্তর্দৃষ্টি দ্রুত কাজে লাগাতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই নিজের মত বা ধারণা অন্যের কাছে প্রকাশ করা কঠিন হয় এদের।
অন্তর্মুখী অনুভূতিপ্রবণ	বিশ্বস্ত, একনিষ্ঠ ও প্রায়শই আদর্শবাদী। গভীর নীতি-মূল্যবোধ-চেতন। কোনো কিছু বিচারে নিজস্ব মানদণ্ড ব্যবহার করে। আশপাশের মানুষ বা কোনো চলতি প্রবণতা দ্বারা সহজে প্রভাবিত হয় না। নিজের পছন্দ-অপছন্দ বিষয়ে সজাগ। সব কাজে লক্ষ্য থাকে। খুব বেশি স্নেহপরায়ণ নয়। মায়া-অনুরাগ গোপনে লালন করে। অন্যদের ভালো বোঝে বলে ধারণা তা যদিও প্রায়শই তা অভিজ্ঞতায় মেলে না।
অন্তর্মুখী চিন্তাশীল	স্থিরবুদ্ধি ও নীতি-আদর্শবান। সহজে অন্যদের দ্বারা চালিত হয় না। বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ ও বিমূর্ত চিন্তা উপভোগ করে। দর্শন, গণিত ও শব্দজট-শব্দজব্দ ইত্যাদিতে আগ্রহ। নিজের কাজের ব্যবহারিক প্রয়োগ বিষয়ে উদাসীন। অন্যের সাথে সহজে মিশতে পারে না বলে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পছন্দ করে।

আচরণবিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্বার্ট শেলডন [১৮৯৮-১৯৭৭] মানুষের স্বভাব ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যকে একসাথে গেঁথে প্রস্তাব করেন তাঁর সুবিখ্যাত 'ফিজিক্যাল সোমাটাইপ' তত্ত্ব।[৬] শেলডনের প্রস্তাব অনুযায়ী, মানুষ চাইলে নিজের শরীরকে নিজের 'ফিজিক্যাল সোমাটাইপ' অনুযায়ী গড়েপিটে নিতে পারে। শেলডনের মানুষেরা 'আকারে-স্বভাবে' ৩ বৈশিষ্ট্যের। এরা হলো এক্টোমরফ, মেসোমরফ ও এন্ডোমরফ। এদের বৈশিষ্ট্যগুলো বিন্যস্ত করা যেতে পারে এভাবে :

শেলডনের ফিজিক্যাল সোমাটাইপ			
ধরন	স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য		শারিরীক বৈশিষ্ট্য
এক্টোমরফ	অ্যাথলিট	মগজ ও চিন্তা দ্বারা পরিচালিত	মেদহীন। হাড়ের কাঠামো ছোটো ও পলকা। সমান বক্ষতল। ছোট কাঁধ। পাতলা শরীর। দ্রুত বিপাকক্রিয়া। শরীরে মাংসপেশি ও পেশির আকার স্বল্প ও ছোট। সহজে ওজন বাড়ে না
মেসোমরফ	পাওয়ার অ্যাথলিট	পেশি বা স্বজ্ঞা দ্বারা পরিচালিত	সামান্য থেকে মোটামুটি মেদ। মধ্যম থেকে দীর্ঘ মজবুত হাড়। সুঠাম মাংসপেশি। মাংসপেশির পরিমাণ ও আকার অধিক ও দীর্ঘ। মধ্যম থেকে উচ্চ বিপাক ক্রিয়া। শরীরে এক্টোমরফদের চেয়ে সহজে মেদ বাড়ে।
এন্ডোমরফ	নন-অ্যাথলিট	সাহস ও আধ্যাত্মিকতা দ্বারা পরিচালিত	মেদবহুল। নরম, গোলগাল ও ছোটখাটো শরীর। দুর্বল বিপাক ক্রিয়া। মাংস, পেশি ও পেশির আকার স্বল্প ও ছোট।

মনোবিজ্ঞানী আব্রাহাম মাসলো [১৯০৮-৭০] মানুষের চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, বাসনা-এষণাকে কেন্দ্র করে ৮ ধাপের একটি ক্রমোচ্চ চূড়াকাঠামো প্রস্তাব করেন। 'হায়ারার্কি অব নিডস' তত্ত্ব নামে এটি পাঠকসমাজে অধিক পরিচিত।[৭] এ তত্ত্বমতে, মানুষের জীবন তৎপরতার মূলে আছে তার চাওয়া বা বাসনার পরিতৃপ্তি। মানুষ নিজ

নিজ বাসনার পরিপূরণ চায়। মাসলো মানববাসনাকে সবচেয়ে মৌলিক ও প্রাথমিক 'ক্ষুধানিবৃত্তি' থেকে ক্রমোচ্চ বা ক্রমোন্নত ৮ ধাপে সজ্জিত করেছেন। তাঁর মতে, সামাজিক মানুষেরা যার যার নিজের ধাপের বাসনা মিটিয়ে পরবর্তী ধাপের লড়াইয়ে রত। হায়ারার্কি অব নিডস তত্ত্বানুসারে, প্রথম ধাপের মানুষের চাহিদা খাবার, নিরাপত্তা ও আশ্রয়। এটি পূরণ হলে দ্বিতীয় ধাপে উন্নীত হয় সে। এ ধাপে তার চাওয়া হয়, একটা স্থায়ী পেশা বা জীবিকা, আর্থিক স্থিতি। তৃতীয় ধাপে সে চাইবে সংযুক্তি, পরিচিতি, গ্রহণযোগ্যতা। এ অবস্থায় উন্নীত হলে চতুর্থ ধাপে তার চাওয়া হবে আত্মস্বীকৃতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠা। মাসলোর পঞ্চম ধাপের মানুষেরা জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠবে। আর ষষ্ঠ ধাপে পৌঁছালে সে চাইবে জগৎ-জীবন সম্পর্কে একটা আত্মিক-বাহ্যিক বোঝাপড়া। সপ্তম ধাপে তাকে ক্ষমতাবান ও সর্বজনীন হয়ে ওঠার বাসনায় পাবে। আর পিরামিডের চূড়ার [অষ্টম ধাপ] মানুষেরা এমন এক মানসিক স্তরে পৌঁছাতে চাইবে, যেখানে সে নিজেকে একজন সৃষ্টিশীল, পরিপূর্ণ ও সফল ব্যক্তিসত্তা হিসেবে আবিষ্কারের আনন্দে তৃপ্ত হবে।

চরিত্র নির্মাণে আব্রাহাম মাসলোর 'চাহিদাকেন্দ্রিক সত্তাকাঠামো'টি একটা দরকারি পাঠ হতে পারে। মাসলোর স্বভাবকাঠামো মানুষের জীবন চাহিদাকেন্দ্রিক লড়াইয়ের একটা পর্যায়ক্রমিক বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। একটি অন্নহীন, ঘরহীন, বিপন্ন ও নিরাশ্রয় মানুষ সামাজিক মর্যাদার লড়াইয়ে রত দেখাতে হলে মানুষটিকে অসংলগ্ন ও অদ্ভুত চরিত্র হিসেবেই হাজির করতে হবে। নাহলে চরিত্রটি বাস্তবসম্মত হবে না; যুক্তিযুক্ত হবে না। কারণ চরিত্রটির ক্রিয়া বা তৎপরতা তার অবস্থা-অবস্থান বা এষণা-তাড়না দ্বারা সিদ্ধ নয়। এমন চরিত্র 'খাপছাড়া' হিসেবে অবশ্য গল্পে আঁকা যেতে পারে [যৌক্তিকভাবে], কোনো বাস্তবধর্মী চরিত্রে এমন সত্তা সংঘাত চরিত্রটির বাস্তবতা গুণকে ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে বিনষ্ট করবে।

আধুনিক সত্তাবিজ্ঞান [অনটোলজি], আধুনিক মনোবিজ্ঞান [সাইকোলজি] ও আধুনিক শারীরবিজ্ঞান [ফিজিওলজি] মানবচরিত্র বিষয়ে জ্যোতিষশাস্ত্রীয় ধারণাকাঠামো বিজ্ঞানসম্মত মনে করবে না। কিন্তু মানুষের জন্মকাল ও তার ওপর লগ্ন নক্ষত্র, গ্রহপ্রভাব, সংখ্যাগুণ, ঋতু কিংবা তিথি, প্রাণী বা বস্তুগুণ ইত্যাদির প্রভাবকে কেন্দ্র করে একধরনের জনপ্রিয় চরিত্রকাঠামো সুপ্রাচীন কাল থেকে আজ অব্দি চালু আছে। রাশিচক্র নামের চরিত্রকাঠামো বিজ্ঞানসম্মত বলে বর্তমান প্রস্তাবনায় জায়গা করে নিয়েছে, এমন নয়। ভারতীয় দর্শনে বৈদিক কাল থেকে রাশিচক্র মানববিজ্ঞানের একটি শাস্ত্রীয় ধারা হিসেবে বিকশিত। সমসাময়িক কালের বলেই, প্রাচীন ইহুদি ঐতিহ্যের কাব্বালাহভুক্ত 'ইনিয়াগ্রাম'-এর সাথে রাশিচক্রকাঠামোর তুলনামূলক পাঠ মানববিজ্ঞানীদের জন্য জরুরি উৎস হতে পারে। চিত্রনাট্যের চরিত্রসৃষ্টিতে 'রাশিচক্র সত্তাকাঠামো' একটি চটজলদি, কার্যকর, সহায়ক নির্দেশিকা হিসেবে

ব্যবহার করা সম্ভব। রাশিচক্রের ১৩টি[৮] জাতকের জন্য চিহ্নিত বৈশিষ্ট্যের পর্দাগুলো চরিত্র রচনায় 'সেট-বৈশিষ্ট্য' হিসেবে ব্যবহার করা যায়। যেমন : তুলা রাশির [২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২৩ অক্টোবর] জাতকদের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হলো 'বিশ্বস্ততা'। আর এদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো হলো শান্ত, কমনীয়, যুক্তিপ্রবণ, তার্কিক, রুচিশীল, সৌন্দর্যপ্রিয়, আদর্শবাদী, সাম্যবাদী, সামাজিক, সহযোগী, সুশৃঙ্খল। জ্যোতিষশাস্ত্রীয় প্রত্যয় নিয়ে তর্কের কথা ভুলে গিয়ে, একটি চিত্রনাট্যে এমন একটি চরিত্র আঁকা যেতে পারে যৌক্তিক মীমাংসা থেকেই। চরিত্রটি জ্ঞানী বলে যুক্তিপ্রবণ, যুক্তিপ্রবণ বলে তার্কিক; চরিত্রটি শান্ত বলে কমনীয়, কমনীয় বলে সৌন্দর্যপ্রিয়। আর এসব গুণের সমাহার চরিত্রটির কেন্দ্রীয় গুণ 'বিশ্বস্ততা'কে গ্রহণযোগ্য করে তুলবে, বাস্তব করে তুলবে। কাঠামোটির একটি বিপরীত ব্যবহারও করা যেতে পারে খুবই বিপ্লবী সম্ভাবনায়। অশান্ত, বিকট, যুক্তিহীন, রুচিহীন, অশিল্পিত, অসামাজিক, অসহযোগী, উচ্ছৃঙ্খল একটি চরিত্রকে গল্পের শেষে দেখানো যেতে পারে খুবই 'বিশ্বস্ত' এক মানুষ হিসেবে, যেখানে মানুষ বিষয়ে মানুষের প্রচলিত ধারণাকাঠামোকে [নাটকীয়তায়] চূর্ণ ও নস্যাৎ করাই গল্পকারের লক্ষ্য। এ পন্থায় রাশিচক্র ধারণার আরও দ্বাদশ সেট চরিত্রবৈশিষ্ট্য গল্প বা নাট্য বা চিত্রনাট্যের চরিত্রনির্মাণে ব্যবহারযোগ্য নির্দেশনা হতে পারে।

এতক্ষণ আমরা মানুষের আকার-আকৃতি, স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, শাস্ত্রীয়, চিকিৎসাশাস্ত্রীয় এবং মৌলিক হিসেবে আধুনিক আচরণবিজ্ঞানের ধ্রুপদী কিছু সত্তাকাঠামোয় সূত্রবদ্ধভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ নিয়েছি। এ পর্যায়ে চরিত্রনির্মাণে হালের পশ্চিমা পেশাজীবী চিত্রনাট্য তাত্ত্বিকদের কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরা যেতে পারে।

চিত্রনাট্য তাত্ত্বিক সিড ফিল্ড, যাঁকে আধুনিক পশ্চিমা চিত্রনাট্যতত্ত্বের গুরু মানা হয়, মনে করেন, একটা চরিত্রের সাথে কতগুলো জিজ্ঞাসা খুবই জরুরিভাবে জড়িত। প্রথমত, গল্পে চরিত্রটির নাটকীয় প্রয়োজন কোথায়? এ মৌলিক প্রশ্নের সাথে জড়িয়ে আছে গল্পে চরিত্রটির চাওয়া কী? এ প্রশ্ন চরিত্রটি নিজের সম্পর্কে কী মত বা ধারণা পোষণ করে? জগৎ ও জীবন সম্পর্কে চরিত্রটির ধারণা কী? সে যেটা করতে চায় বা করতে চলেছে, আসলেই সেটা সে চায় কি না? কী তার জাতধর্ম? কী তার জীবন-জীবিকা, রুচি-অভ্যাস, খাবারদাবার, পছন্দ-অপছন্দ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস ইত্যাদি। আর গল্পের শেষে চরিত্রটির কি কোনো সুনির্দিষ্ট পরিণতি দেখানো হবে? হলে তা কী? এসব প্রশ্নের জালে ফেলে চরিত্রকে ছকে নেওয়া চরিত্রনির্মাণের প্রাথমিক শর্ত হিসেবে বিবেচনা করেন তিনি। তিনি মনে করেন, গল্পের প্রতিটি চরিত্রকে [বিশেষত চরিত্রধর্মী কাহিনিচিত্রে] একটি নির্দিষ্ট [সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক] অবস্থা থেকে [যৌক্তিক] বদল বা রূপান্তরের ভেতর দিয়ে

যেতে হবে। নতুবা গল্পের চরিত্রকে ক্রিয়াশীল, চলমান, গতিশীল, বিশ্বাসযোগ্য ও জীবন্ত দেখাবে না। চরিত্রটি গতিশীল চেতনার সক্রিয় উপস্থিতি নিয়ে দর্শকমনে স্থায়ী দাগ কাটবে না। সিড ফিল্ডের মতে, ভালো-মন্দ সব মানুষের সামাজিক ক্রিয়া-তৎপরতা উদ্দেশ্যনির্ভর। প্রতিটি মানুষই নিজস্ব উপায়ে কিছু না কিছু অর্জনে তৎপর, তাই তারা ক্রিয়াশীল। গল্পের চরিত্রগুলোর ক্রিয়াশীলতার নেপথ্য কারণ স্পষ্ট করতে পরামর্শ দেন তিনি।

সিড ফিল্ড তত্ত্ব-কাঠামোয় গল্পে চরিত্রসমূহের বিকাশ-বদলকে জরুরি মানা হয়েছে। একটি চরিত্র লোকসান থেকে লাভে, অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসে, অন্তর্মুখী থেকে বহির্মুখিতায়, অসহন থেকে সহনশীলতায়, লাজুক থেকে প্রত্যয়ীতে, প্রত্যাহার থেকে সংযুক্তিতে, স্বপ্ন থেকে বাস্তবে ও বিদ্বেষ থেকে ভালোবাসায় বদলাতে পারে। চরিত্রটি বদলাতে পারে ঠিক তার উল্টো দশায়। সিড ফিল্ড প্রস্তাব করেন, একটি সুচিত্রিত চরিত্রের ইনার ড্রাইভ বা ইনার অ্যাটিচিউড স্পষ্ট হওয়া জরুরি। চরিত্রটি ইতিবাচক কি নেতিবাচক, নাক-উঁচু কি হীনম্মন্য, জটিল কি সহজ, নৈরাশ্যবাদী কি আশাবাদী, আনন্দিত কি বিষাদগ্রস্ত, দুর্বলমনা কি সবলমনা, কঠিন কি কোমল—এসব অন্তর্দশা চরিত্রে স্পষ্ট হওয়া জরুরি মানেন তিনি। মনে করেন, এ ইনার ড্রাইভগুলো যুক্তিগ্রাহ্যভাবে কোনো চরিত্রে স্পষ্টতা পেলে চরিত্র গভীরতা পায়।[৯]

পশ্চিমা চিত্রনাট্যের বদল বা রূপান্তর তত্ত্ব থেকে 'ক্যারেক্টার আর্ক' ধারণাকাঠমোর বিকাশ। একটি গল্পে বা চিত্রনাট্যে চরিত্র বা চরিত্রগুলো কীভাবে আবির্ভূত হলো, বিকশিত হলো এবং একটি ইতিবাচক বা নেতিবাচক অবস্থায় পরিণতি পেল, তা ছকে নিতে পথ দেখায় ক্যারেক্টার আর্ক। চরিত্রসমূহের মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তরকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মানা হয় এতে। মনে করা হয়, গল্পের চরিত্রগুলো তৈরি হয় গল্পেরই প্রয়োজনে। সে ক্ষেত্রে প্রতিটি চরিত্রই গল্পের সাথে অনিবার্য ও কার্যকারণ সূত্রে গাঁথা। কোনো চরিত্রই গল্পের উৎসবে অকারণ আমন্ত্রিত নয়, গল্পে যার কোনো পরিণত ভূমিকা নেই। আর তাই চিত্রনাট্য লেখকের দায় গল্পের উদ্দেশ্যের সাথে চরিত্রের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে যৌক্তিক ও কার্যকারণ সূত্রে গেঁথে চরিত্রগুলোর কাম্য বদল বা রূপান্তর বিষয়ে সচেতন থাকা।[১০]

প্রথাগতভাবে ধরে নেওয়া হয়, বিশেষত কাহিনি চলচ্চিত্রে, গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বা কেন্দ্রীয় চরিত্রসমূহের বিকাশ-পরিণতি আসল কথা। যেহেতু গল্পের মূল উদ্দেশ্যকে পরিণাম দেয় কেন্দ্রীয় চরিত্র, সেহেতু কেন্দ্রীয় চরিত্রের বিকাশ, বদল ও পরিণতিই চূড়ান্ত কথা। এটি সাধারণত নায়কাভিযান [হিরোজ জার্নি] ও দ্বন্দ্বমূলক [কনফ্লিক্টিং] কাহিনিচিত্রের প্রতিষ্ঠিত লক্ষণ। গল্পজুড়ে নায়ক চরিত্রের জন্ম বা আবির্ভাব, বিকাশ, বদল ও পরিণতি আঁকা হয় এসব কাহিনিচিত্রে। নায়ক ও নায়িকা বা কেন্দ্রীয় চরিত্রের নিরাশা থেকে আশায়, অনিশ্চিতি থেকে বিশ্বাসে, যাতনা থেকে নিরাময়ে,

ভয় থেকে প্রত্যয়ে, বন্ধন থেকে মুক্তিতে, দুর্দশা থেকে সুদশায় অথবা বিপরীত পরিস্থিতিতে বদলই এ ধরনের গল্পের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এমন গল্পের চরিত্রসমূহের স্রষ্টাকে এসব মৌলিক প্রশ্নসমূহের মুখোমুখি হবার প্রস্তাব রাখেন আধুনিক চিত্রনাট্য তাত্ত্বিকগণ : গল্পে চরিত্রটির ভূমিকা কী? সে কী চায়? তার চাওয়ার পথে সে কীভাবে এগোয়? কোন বিন্দুতে বা পরিস্থিতিতে সে বদলাতে থাকে? কোন কার্যকারণ তাকে বদলাতে সাহায্য করে? গন্তব্যে পৌঁছাতে সে কোন ধরনের পদক্ষেপ নেয়? কী কী মূল্যে বাজি ধরে? তার প্রাপ্তির স্বরূপ কী? এসব যৌক্তিকভাবে ছকে নেবার তাগিদ বোধ করেন তাঁরা।

প্রথাগত দ্বন্দ্বমূলক কাহিনিচিত্রে এক সেট চরিত্র থাকে, যাদের সদর্থক-নঞর্থক [প্রোটাগনিস্ট-এন্টাগনিস্ট]–এ দুই বর্গে ভাগ করা হয়। এমন বিভাজনেও উভয় বর্গের চরিত্রসমূহেরই নিজস্ব চাওয়া, নিজস্ব বাজি [স্টেক], নিজস্ব উৎসর্গ ও মূল্যদান এবং পরিণাম অটুট রাখার দাবি থাকে। যদিও দ্বন্দ্বমূলক নায়কাভিযান কাহিনিচিত্রে ইতিবাচক কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলোর ক্ষেত্রেই কেবল এ বিষয়ে সচেতন থাকতে দেখা যায়। কিন্তু এটা গুরুত্বপূর্ণ যে এন্টাগোনিস্ট বা নেতিবাচক চরিত্রগুলোও একটা সুনির্দিষ্ট কার্যকারণ থেকে পরিস্থিতিপ্রাপ্ত। তার আকাঙ্ক্ষা বা গন্তব্যেরও তাই একটি যৌক্তিক শৃঙ্খলা থাকা গুরুত্বপূর্ণ। নতুবা নায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিত্রের জ্বলন্ত বাসনার [বার্নিং প্যাশন] পথে অকারণ বাধা বা দ্বন্দ্ব-সংঘাত তৈরি করা ছাড়া তাদের কোনো উদ্দেশ্যই থাকে না। বাণিজ্যিক হিরোজ জার্নি বা নায়কাভিযান গল্পকাঠামোর বেশির ভাগ চরিত্রই উদ্দেশ্যহীন, ভূমিকাহীন, আকস্মিক ও আরোপিত। এমন চরিত্রকাঠামোর অনুকরণ গল্পলেখকের জন্য দারুণ আত্মঘাতী প্ররোচনা।

চরিত্রনির্মাণে প্রচলিত একটি ধারণাকাঠামোর নাম 'থ্রি ডিমেনশনাল ক্যারেক্টার আর্ক'। এ ধারণায় চরিত্রসমূহকে শারীরিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক–এ তিন মাত্রায় ঘনত্ব দেবার দাবি মানা হয়।[১১] এ তত্ত্বে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত:

বয়স, ওজন ও উচ্চতা; চোখ, চুলও গায়ের রং; পোশাক ও সজ্জা; কোনো নির্দিষ্ট শারীরিক আকার বা ভঙ্গি; বিশেষ কোনো অভ্যাসগত আচরণ; কথা ও কণ্ঠস্বর; বিশেষ কোনো জন্মদাগ; কোনো অভ্যাস বা স্বভাব ইত্যাদির সুনির্দিষ্টতা, যা তার 'শারীরিক মাত্রা';

অন্যদিকে; চরিত্রের জাতি, ধর্ম ও জাতীয়তা; জন্মস্থান-জন্মভূমি; পারিবারিক পটভূমি; বৈবাহিক, সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান; ভাষা ও শিক্ষা; পেশা ও জীবিকা; আগ্রহ, সংযোগ ও নৈতিকতা; রাজনৈতিক চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভূমিকা ইত্যাদি, যা তার 'সামাজিক [সাংস্কৃতিক] মাত্রা';

আর চরিত্রসমূহের অন্তর্মুখিতা-বহির্মুখিতা, অনুভব-অনুভূতি, বাসনা-এষণা,

স্বপ্নচারিতা, পছন্দ-অপছন্দ, রসবোধ ও জীবনের লক্ষ্য ইত্যাদি, যা তার 'মনস্তাত্ত্বিক মাত্রা'। এ তত্ত্ব মনে করে, এ তিন মাত্রায় গল্পের চরিত্রকে ঘনীভূত করা গেলে তাদের অস্পষ্ট, অনুজ্জ্বল ও নির্জীব মনে হবে না।

সংলাপ চিত্রনাট্যের অন্যতম প্রধান 'স্বতন্ত্র' উপাদান হিসেবে স্বীকৃত ও আলোচিত। সংলাপহীন চরিত্র সম্ভব হলেও চরিত্র ছাড়া সংলাপের সুযোগ নেই যেহেতু, সেহেতু চরিত্র ও সংলাপ চিত্রনাট্যে একীভূত সত্তা। চরিত্র নির্মাণের আলোচনায় সংলাপ অংশ হয়ে পড়ে তাই লিঙ্গ, বয়স, পেশা, জন্মস্থান, জাতি, ধর্ম, শ্রেণি, বিত্ত, স্বভাব, শিক্ষা ও রুচি ইত্যাদি ভেদে একই ভাষিক জাতীয়তার মানুষদের ভেতরও ভাষাব্যবহারের স্বাতন্ত্র্য কিংবা ভিন্নতা থাকে। সংলাপে ওই সব স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট করার তাগিদ মানতে হয় চিত্রনাট্য লেখককে। নয়তো ত্রিমাত্রিকতার সূত্রে রচিত চরিত্রসমূহের জরুরি স্বাতন্ত্র্যরেখাগুলো লুপ্ত হয়ে সবাই একাকার হয়ে যাবে। তা ছাড়া একটি চরিত্র স্বল্পভাষী কি অতিভাষী, উচ্চভাষী কি মৃদুভাষী, মানভাষী কি অঞ্চলভাষী, সুভাষী কি ইতরভাষী, স্পষ্টভাষী কি অনচ্ছভাষী এবং মধুরভাষী কি কর্কশভাষী ইত্যাদির সচেতনতাও চরিত্রনির্মাণে জরুরি মনোযোগের বিষয়।

চরিত্র ও ক্রিয়া [অ্যাকশন] নাট্যের ক্ষেত্রে সমার্থক মানছেন স্বয়ং অ্যারিস্টটল। নাট্যে ক্রিয়া বলতে বোঝায় চরিত্রসমূহের গতিশীল শারীরিক তৎপরতা। উল্লেখ জরুরি যে এ ক্ষেত্রে চরিত্র বলতে কেবল 'মনুষ্যবাচক' প্রাণীকে বোঝানো হবে না। একটি বহতা নদী, একটি বটগাছ বা পোষা এক প্রাণীও চরিত্র হতে পারে। চিত্রে এদের ক্রিয়া বা অ্যাকশনও আমরা পাই। সংলাপ হলো মনুষ্যচরিত্রের কথামূলক অ্যাকশন বা ক্রিয়া। চরিত্রভেদে সংলাপের যৌক্তিক ভিন্নতা বা স্বাতন্ত্র্য চরিত্রের ক্রিয়াশীলতাকে বাঙ্ময় করবে। পাশাপাশি চরিত্রনির্মাতাকে সাবধানও থাকতে হবে যে চলচ্চিত্র চিত্রাত্মক ভাষামাধ্যম। চরিত্রমুখে সংলাপের বন্যা বইয়ে দিলে চিত্রভাষার সম্ভাবনা ধ্বংস হতে পারে। এ প্রসঙ্গেই গুরুত্বের সাথে আলোচনায় আসে 'সাবটেক্সট'। সাবটেক্সট একধরনের চরিত্রক্রিয়া, যা সংলাপের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত। কোনো চরিত্র কথা বা বচনের [সংলাপ] বিকল্প হিসেবে শারীরিক ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেও 'কথা' প্রকাশ করে। কোনো একটা ক্রিয়ার বিপরীতে প্রতিক্রিয়া না করাও একধরনের প্রতিক্রিয়া। সংলাপের বিকল্প হিসেবে সাবটেক্সটের ব্যবহার গল্পের চরিত্রকে গভীর করে তোলার সবচে মোক্ষম সুযোগ। কারণ, চরিত্রগুলোর মুখে কথা যত কম থাকবে, চরিত্রগুলো তত অ্যাকশন বা ক্রিয়ানির্ভর হবে। চরিত্রগুলোকে গতিশীল দেখাবে। সাবটেক্সট চরিত্রের পাশাপাশি চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষাকেও গভীরতা দেয়। উল্লেখ জরুরি যে চলচ্চিত্র একটা লেখনমাধ্যম। এখানে লেখা হয় চিত্র বা ছবির মাধ্যমে, যে ছবির সাথে শব্দ ইত্যাদি যোজিত হয়। কিন্তু চিত্র নিজেই এক শক্তিশালী ভাষা। চলচ্চিত্র বা চলন্ত ছবির গতিশীল

ক্রিয়াশীলতার মধ্যেই আছে এক শক্তিশালী প্রকাশ। এ প্রকাশ চিত্রভাষার। তাই চিত্রনাট্যকারকে সচেতন থাকতে হয়, চরিত্রমুখের সংলাপ যেন চিত্রভাষাকে তুচ্ছ করে না ফেলে। তাহলে চলচ্চিত্র তার নিজস্ব ভাষার শক্তি হারিয়ে একটা ভাষিক ন্যারেশন মাত্র হয়ে পড়বে।[১২]

চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে চরিত্রের নামকরণ একটি জরুরি সচেতনতা বলে প্রস্তাব করা যায়। বহু বিখ্যাত গল্পলেখককে তাঁর চরিত্রদের নামকরণ নিয়ে রীতিমতো সমস্যায় পড়তে দেখা গেছে। অনেক ভনিতার পর রবীন্দ্রনাথ যেমন ঘোষণা দেন : 'আচ্ছা তাহার নাম দিলাম শিশির' [হৈমন্তী]-এর মতো। চরিত্রনির্মাতা চরিত্রের নামের ভেতর গুঁজে দিতে পারেন তাৎপর্যের বীজ। চরিত্রের কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য, গুণ, লক্ষ্য ও তাৎপর্য থেকে আসতে পারে তার নাম। এমনকি ওই গুণ বিরোধাভাস হিসেবেও আসতে পারে। ধরা যাক, 'চন্দ্রা' নাম দেওয়া যেতে পারে তার, যে হয় অতিশয় রূপবতী, নয় একেবারেই রূপবতী নয়। মাঝামাঝি রূপের কোনো চরিত্রের এ নাম তাৎপর্যহীন। এ ধরনের নামকরণকে দৈবচয়িত নামকরণ বলা যেতে পারে। বৈশিষ্ট্য বা গুণের অনুরূপ নামকরণ চরিত্রকে নামের আভিধানিক তাৎপর্যে মাত্রা দেবে। আর বৈশিষ্ট্য বা গুণের বিপ্রতীপ নামকরণ চরিত্রকে বিরোধ বা বাঁকা তাৎপর্যের ব্যঞ্জনায় গভীরতা দেবে। নামকরণ কখনো কখনো ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপারও। 'মহম্মদ' নামের কোনো চরিত্রকে তরবারি হাতে সীমারের ভূমিকায় আঁকা বিকট দুঃসাহসের ব্যাপার। কারণ, এ নামটির ঐতিহ্যগত বিরোধাভাস একটি বিশাল সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বিশ্বাস ও মান্যতাকে নস্যাৎ করে। বুদ্ধ নামের একটি ডোম চরিত্র, পদ্ম নামের একটি সাহসী ও তীব্র নারী চরিত্র বা হিটলার নামের খুবই মমতাময় একটি চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-ব্যঞ্জনার মাত্রা পাবে। চরিত্রলেখককে মনে রাখতে হয়, নামের ভেতরে নিহিত রাখা যাবে একটি চরিত্রের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইঙ্গিতরেখা। তাই চরিত্রচিত্রণে নামকরণ অন্যতম সচেতনতার বিষয়। প্রথাগত গল্পে এক সেট চরিত্রের এক সেট দৈবচয়িত নামই দেখতে পাওয়া যায়। এমন অপরিশ্রমী নামকরণে চরিত্রগুলোকে বাঙ্ময় করে তোলার সুযোগটি উপেক্ষিত থাকে।

বাণিজ্যিক, দ্বন্দ্বমূলক, বিনোদনধর্মী ও জনপ্রিয় কাহিনি মূলধারার সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির প্রধান গল্পপণ্য। এ ধরনের গল্প অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিরোজ জার্নি বা নায়কাভিযান গল্পকাঠামোয় বিন্যস্ত করা হয়। নায়কাভিযান চরিত্র আদিরূপ [ক্যারেক্টার আর্কেটাইপ]-কে কাঠামোবদ্ধ করেছেন প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিক জোসেফ ক্যাম্পবেল [১৯০৪-৮৭]। পৃথিবীর হাজারখানেক পৌরাণিক আখ্যান বিচার করে আ হিরো উইথ থাউজেন্ড ফেসেস [১৯৪৯] গ্রন্থে প্রস্তাব করেন তিনি, তাঁর নায়কাভিযান চরিত্র আদিরূপ বা হিরোজ জার্নি ক্যারেক্টার আর্কেটাইপ। পৌরাণিক পৃথিবীর প্রায় সব

উপাখ্যানমূলক রচনার হিরো বা নায়কদের অভিযানকে একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্যে দেখতে পান তিনি। এটাকে ক্যাম্পবেলের 'মনোমিথ'[১৩] নামেও অভিহিত করা হয়। ক্যাম্পবেল আবিষ্কার করেন, উপকথার সব নায়ককেই প্রায় একই কাঠামোবদ্ধ পথ-পরিক্রমায় তাদের অভীষ্টে পৌঁছাতে হয়। এই পৌরাণিক-নৃতাত্ত্বিক গল্পকাঠামোটি পশ্চিমা চিত্রনাট্যতাত্ত্বিক ক্রিস্টোফার ভোলগার [১৯৪৯] খানিকটা সংস্কার করে তাঁর দ্য রাইটার্স জার্নি [১৯৯২] নামক গ্রন্থে পুনরাবিষ্কার করলে গত শতকের নব্বইয়ের দশকের হলিউড গল্প লেখকগণ রীতিমতো বাইবেল হাতে পেলেন।

নৃতাত্ত্বিক জোসেফ ক্যাম্পবেল ও আধুনিক পশ্চিমা চিত্রনাট্যতাত্ত্বিক ক্রিস্টোফার ভোলগারের [১৯৪৯] প্রস্তাবিত নায়কাভিযান গল্পের কাঠামো অনুযায়ী : নায়ক চরিত্রের অভিযাত্রা শুরু হয় একটি সাধারণ বাস্তব অবস্থা থেকে [অর্ডিনারি ওয়ার্ল্ড]। সুনির্দিষ্ট ঘটনাসন্ধিতে অতঃপর কেউ একজন তার সামনে আসবে, তাকে ডাকবে সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ নিতে। নায়ক প্রথমটায় সম্মত হবে না, এড়াতে চাইবে। সুনির্দিষ্ট ঘটনাসন্ধিতে কোনো একজন পথগুরুর আবির্ভাব ঘটবে তার সামনে। তিনি নায়ককে এমন কোনো অলৌকিক, [অতিমানবীয়, অপ্রাকৃতিক] অস্ত্র বা ক্ষমতা বা বোধ-চেতনা-মন্ত্র দেবেন, যা দ্বারা নায়ক তার অভিযাত্রায় শামিল হতে বিপদ বা দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে উদ্বুদ্ধ হবে, প্রেরণাবোধ করবে। অতঃপর নায়কের আসল যাত্রা। এ পর্যায়ে নায়ক প্রথম বাধা বা পরীক্ষার মুখোমুখি হবে এবং পরিচিত হবে তার মিত্র ও শত্রুদের সাথে যারা ন্যায় কিংবা সত্য-সুন্দর-শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অথবা তা প্রতিরোধ করতে পরস্পরের সাথে দ্বন্দ্বরত। যে যাত্রায় তারা পরস্পরের প্রতিশোধপরায়ণ উদগ্র বাসনা [বার্নিং প্যাশন] নিয়ে বিচলিত। জঙ্গম পরিস্থিতির প্রথম ধাপে দেখা যাবে নায়ক মুখোমুখি হবে এমন একজনের যে বন্ধু হয়ে আবির্ভূত হবে, অথচ সে শত্রু; অথবা শত্রু হিসেবে আবির্ভূত হবে, অথচ পরম বন্ধু। এরপর তার সাথে সাক্ষাৎ ঘটবে নায়িকার [যদি চরিত্রটি হিরোইন বা নায়িকা হয়, তবে সে সাক্ষাৎ পাবে নায়ক বা বন্ধু বা সহযাত্রীর]। এ পর্যায়ে তারা উভয়ে মিলে শত্রুগুহায় ও শিবিরে প্রবেশ করবে। শত্রুপক্ষের কাছ থেকে তাদের অভীষ্ট বস্তুটি হরণ করে পালিয়ে আসবে। পথে তাকে কঠোর ও চূড়ান্ত বাধার মুখোমুখি হতে হবে। অবশেষে ফিরে আসবে সে বা তারা। প্রতিষ্ঠিত করবে তাদের পরিবারে, সমাজে, সম্প্রদায়ে, রাজ্যে, রাষ্ট্রে বা পৃথিবীতে হারানো শক্তি বা অপহৃত গৌরব। 'হিরোজ জার্নি মনোমিথ' কাঠামোয় তাই এক সেট কাঠামোবদ্ধ চরিত্রকে নিয়ম হিসেবে উপস্থিত হতে দেখা যায়। নায়ক, আমন্ত্রক, গুরু, ছদ্মবেশী বন্ধু বা শত্রু, প্রতারক, মিত্রগণ, শত্রুগণ এবং অদৃশ্য, গোপন ভিলেন বা আসল খলনায়ক। নায়কাভিযানমূলক চিত্র আখ্যানে এ চরিত্রকাঠামো জনপ্রিয়, বিনোদনধর্মী ও বাণিজ্যিক গল্পের চরিত্র সৃষ্টিতে কাজে আসতে পারে। ঐতিহ্যানুগ এই ক্যারেক্টার

আর্কেটাইপ চিত্রনাট্য লেখককে চরিত্রনির্মাণে একটি সোজাসাপ্টা পথ দেখাতে পারে।[১৪]

চিত্রনাট্য লিখন মৌলিক সৃজনশীল কাজ। সৃজনশীল কাজে লেখকের অনুরাগ, আগ্রহ, নিবেদন ও ঐকান্তিকতাই প্রাথমিক শর্ত। পাশাপাশি পঠন-পাঠনতত্ত্বের অনুসরণ অনুশীলন ইত্যাদি লেখকের স্বতঃস্ফূর্ত ও সৃজনশীল আবেগকে জ্ঞান ও যুক্তির শৃঙ্খলা দিতে পারে। চিত্রনাট্য লেখক এই পথে অপরাপর লেখক-চিন্তকদের মত-মতাদর্শগুলো নিজের অভিজ্ঞতায় মিলিয়ে নিতে পারেন। বুঝে উঠতে পারেন গল্পলিখন বিষয়ে তার নিজস্ব চিন্তার ঘাটতি-বাড়তি ঠিক কোনখানে। 'চরিত্রনির্মাণ' কাহিনি চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রধান উপাদান ধরে নিয়ে মানবচরিত্র-বৈশিষ্ট্য বিষয়ে কিছু পৌরাণিক, শাস্ত্রীয়, চিকিৎসা শাস্ত্রীয় ও শারীরতত্ত্বীয় ধারণাকাঠামো বর্তমান প্রস্তাবনায় উপস্থাপন করা হলো। এসব সূত্র-অভিজ্ঞান মানবচরিত্র বিষয়ে গল্পলেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে স্বচ্ছতা ও গভীরতা দেবে বলে মনে করি। পরিশেষে আবারও বলতে চাই, নিখুঁত চরিত্রনির্মাণ নির্ভর করে মানব ও মানবজীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে বোঝাপড়ার ওপর যার জন্য অবিরামভাবে মানুষ ও তার জীবনকে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, অনুভব ও উপলব্ধি ব্যতীত অন্য কোনো পথ খোলা নেই।

টীকা ও সহায়ক গ্রন্থ

১. অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, শিখা প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ৪১-৪৬।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৪০।

৩. The Enneagram of Personality, or simply the Enneagram is a geometric model of human psyche, which referes that nine personality types of human are interconnected. Although the history or origins, ideas associated with ennegram personaity or ennegram is matter of dispute. But the contemporary Enneagram idea is generally develeoped from the teaching of Oschar Ichazo and Cloudio Naranjio. The enneagram figure is usually composed of three parts; a circle, an inner triangle and an irregular hexagonal.These three elements constitute the usual enneagram figure.

https://www.integrative9.com/enneagram/

৪. http://www.bartleby.com/65/hu/humor.html

৪. Psychological Types, C. G. Jung, Trans. Godwin Baynes, 1946, p. 412-428, 471-480.

৫. বিস্তারিত : Herbert Sheldon, The Varities of Human Pdyche, An Introduction to Constitutional Psychology, Harper & Brothers, 1940.

৭. http://www.shkaminski.com/Classes/Handouts/Maslow.htm

৮. A Guide to Feature Film Writing, J. T. Velikovsky, 2003, p.36-37.

৯. Screenplay, The Foundations of Screenwriting, Syd Field, Dell, 1984, p.63-73.

১০. Syd Field, ibid, 1984, p.43-74.

১১. The Art of Dramatic Writing, Lagos Egri, Simon & Schuster, 2004, p.148, 177, 186.

১২. Syd Field, ibid, 1984, p.221.

১৩. http://www.movieoutline.com/articles/the-hero-journey-mythic-structure-of-joseph-campbell-monomyth.html.

১৪. বিস্তারিত : The Writer's Journey, Mythic Structure for Writers, Michael Wiese Productions, 1998.

লেখক পরিচিতি

ড. সেলিম মোজাহার : সহযোগী অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অব ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ছবিতে কথোপকথন

ফরিদুর রহমান

In many of the films now being made, there is very little cinema: they are mostly what I call 'photographs of people talking.' When we tell a story in cinema we should resort to dialogue only when it's impossible to do otherwise... Alfred Hitchcock

আলফ্রেড হিচকক প্রায় চল্লিশ বছর আগে সে সময়ের চলচ্চিত্র সম্পর্কে যে অভিযোগ তুলেছিলেন, আজ এতদিন পরও আমাদের চলচ্চিত্র সম্পর্কে একই কথা বলা যায়। পর্দায় উপস্থিত চরিত্রগুলোর কথা বলার ছবি ছাড়া বেশির ভাগ চলচ্চিত্র বা টেলিভিশন নাটকে আর কিছু থাকে না বললে অত্যুক্তি হয় না। মঞ্চে সংলাপই নাটকের প্রাণ, সেখানে অ্যাকশন, আবহ সংগীত এবং কোরিওগ্রাফি–সবই সংলাপকে শক্তি জোগায় বা সংলাপের ঘাটতি পুষিয়ে দেয়। বেতার নাটকেও চোখের দেখার অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে পাত্রপাত্রীর কথোপকথন। কিন্তু সিনেমায় যখন চোখের সামনে ঘটনা ঘটছে, জীবন্ত চরিত্রেরা সব নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে, তখন তাদের মুখে সারাটা সময়জুড়ে কথা বলিয়ে গল্প উপস্থাপন চিত্রনাট্য রচয়িতার দুর্বলতাই প্রকাশ করে।

চলচ্চিত্রে কাহিনি বর্ণনার প্রয়োজনে, কাহিনির সাথে সম্পর্কিত চরিত্রের বিকাশ ও পরিণতির ক্রমবিবর্তনের লক্ষ্যে, ঘটনার পরিবেশ পরিস্থিতি, সময় ও অবস্থান স্পষ্ট করে তুলে ধরার স্বার্থে এবং চরিত্রগুলোর নানামুখী দ্বন্দ্ব, সংকট, মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রকাশের উদ্দেশ্যে সংলাপ অবশ্যই ব্যবহৃত হবে। তবে চলচ্চিত্র বা টেলিভিশনের মতো প্রধানত দৃশ্য মাধ্যমে সংলাপের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার। সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যকার এবং টেলিভিশনের পাণ্ডুলিপি রচয়িতা যদি কয়েকটা বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, তাহলে সংলাপ হয়ে উঠতে পারে উপভোগ্য এবং একই সাথে দৃশ্যে অপরিহার্য অনুষঙ্গ।

সংলাপে দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য

সদ্য বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী রমনা রেস্তোরাঁয় বসে কফি খেতে খেতে গল্পগুজব করে একটি চমৎকার বিকেল কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এই গতানুগতিক জীবনের

স্বাভাবিক কথোপকথন দিয়ে পরিপূর্ণ চমৎকার বিকেল কোনো কাহিনির প্লট হয়ে ওঠে না। অবশ্য হঠাৎ করেই যদি ওয়েটারের হাতের কফির কাপ থেকে খানিকটা গরম কফি তরুণীর শখের শাড়িতে ছলকে পড়ে অথবা একটা এসএমএস নিয়ে দুজনের কাড়াকাড়ির একপর্যায়ে তরুণের হাতের দামি মোবাইল সেট যদি টুপ করে রমনা লেকের পানিতে পড়ে যায়, তাহলে ভিন্ন কথা। সেই ঘটনা বা অঘটনের মুহূর্ত থেকেই দ্বন্দ্বের সূচনা হতে পারে।

বাস্তবে নিত্যদিনের স্বাভাবিক কথোপকথন নিঃসন্দেহে জীবনযাপনের অংশ। তেমন মজার কোনো আলোচনা না হোক, স্কুলের গেটে পুত্র-কন্যার ছুটির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা দুজন গৃহবধূ রান্নাবান্নার আলাপ করে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু একজন তৃতীয় পক্ষ হিসেবে এই আলাপ কারো আগ্রহের বিষয় হতে পারে না। অতএব, দর্শক যাতে নাটকে বা চলচ্চিত্রে বিরক্তিকর সংলাপ শুনে হাই তুলতে শুরু না করে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

সংলাপে এই আগ্রহ উত্তেজনা বা আকর্ষণ কীভাবে বাড়ানো যায়?

দুই চরিত্রের দুটি ভিন্ন লক্ষ্য ঠিক করতে হবে। একজন যেখানে পৌঁছাতে চায়, অন্যজন ঠিক তার উল্টো পথে। দুজনের যুক্তি তর্ক শেষ পর্যন্ত চিৎকার-চেঁচামেচিতে শেষ করতে হবে, এমন নয়। তবে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বা অন্তর্নিহিত উত্তেজনা এবং একধরনের উৎকণ্ঠা দর্শককে দৃশ্যের শেষ পর্যন্ত বসে থাকতে বাধ্য করবে। চরিত্রগুলো যখন তাদের সংলাপের মধ্য দিয়ে নতুন লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায়, তখন কাহিনি বিস্তারের পরবর্তী পর্যায়েও তা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।

একটি 'সিচুয়েশন' বা পরিস্থিতি থেকে দুটি চরিত্রের দুই বিপরীতমুখী অবস্থান তাদের সংলাপের মধ্য দিয়ে তুলে ধরার একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

'কবি ও অধ্যাপক আফছার আজম সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে বলে যে খবর দেশজুড়ে প্রচারিত হয়েছে, সেটা আসলে একটা গুজব ছাড়া আর কিছু নয়।'
'থামেন থামেন। কী যা-তা বলছেন আপনি! আপনি কি এটাই বিজ্ঞাপন দিতে চান নাকি?'
'হ্যাঁ। আসলে ছোট একটা ভুল-বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। আফছার মরেনি।'
'না না। এ খবর আমি নিতে পারব না। আফছার আজম মরেনি, তার প্রমাণ কী? আপনি বললেই তো আর হলো না।'
'আপনি কী প্রমাণ চান, বলুন? আফছার আজম নিজে যদি এসে বলে?'
'সে ভিন্ন কথা।'
'আমিই অধ্যাপক আফছার আজম। এখন বিজ্ঞাপন নিতে কোনো সমস্যা আছে

আপনার?'

[মিডিয়া ভার্সেস নোবডি: মোজাফ্ফর হোসেন]

চলচ্চিত্রে নিত্যদিনের আটপৌরে সংলাপ ব্যবহার করা যাবে না, তা নয়। স্বাভাবিক সংলাপ রচনার পাশাপাশি কখনো কখনো সংলাপ রচনার রীতি-পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলেই এগোতে হবে। অনেক সময় সামান্য তথ্য আদান-প্রদানের জন্যও সংলাপ ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহের বড় পরিসরে চরিত্রগুলোর বৈপরীত্য এবং দ্বন্দ্বই সংলাপকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়।

সংলাপের উদ্দেশ্য

সংলাপ যদি কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সেই কথোপকথন যত দ্বন্দ্বমধুরই হোক না কেন, তা নির্দ্বিধায় বাদ দেওয়া যেতে পারে।

সংলাপের উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে কয়েকটিকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। প্রথমত সংলাপ কাহিনিকে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে বয়ে নিয়ে যাবে। অর্থাৎ প্লটকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে সংলাপ। দ্বিতীয়ত সংলাপ একেকটি চরিত্রকে জানতে এবং বুঝতে সাহায্য করবে। চরিত্রের বলা কথা থেকেই চরিত্রটিকে গভীরভাবে অনুধাবন করা বা তার অন্তর্নিহিত স্বরূপ সন্ধান করা সম্ভব। তৃতীয়ত কাহিনির দৃশ্যমান বর্তমানের বাইরে অতীতের প্রয়োজনীয় তথ্য সংলাপের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। অতীত ও বর্তমান ছাড়াও ভবিষ্যতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে সংলাপের মাধ্যমে। চতুর্থত সংলাপ একটি ছবিতে পরিবেশ-পরিস্থিতি, সময়সহ 'মুড' সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

মোমের আলোতে মেঘলার অতি সাধের স্বর্ণালংকার চকচক করে উঠল। হাত দুটো নামিয়ে আবার আঁচল দিয়ে ঢেকে দিল। লাবু বলল, 'ঢেকে আর কী হবে। পরেই তো ফেলেছ।'

মেঘলা বলল, 'দুটো চুড়ি ছাড়া তো কিছু না, থাকলই-বা হাতে।

'আসলে তুমি নিজেই জানো না ও দুটো কী পরেছ। শুধু চুড়ি তো তুমি পরোনি মেঘলা, তুমি তো আমাকে দীর্ঘশ্বাসের মালা পরালে। জীবন একটাই। আর একবার শুরু থেকে শুরু হলে ও চুড়ির কিছুমাত্র দাম ছিল না।'

[স্বর্ণলতার বৃক্ষ চাই: খায়রুল আলম সবুজ]

শ্রুতিমধুর বা চাতুর্যপূর্ণ সংলাপ ব্যবহারের যদি কোনো যৌক্তিক কারণ না থাকে, তবে তা নির্মোহভাবে ছেঁটে ফেলাই সবচেয়ে ভালো। কবিতার পঙ্‌ক্তির মতো সুনির্বাচিত শব্দের ব্যবহার বা আলংকারিক শব্দ একটি কাব্যভাবনা প্রকাশের জন্য বা

কখনো একটি বিশেষ চরিত্রের মুখে কোনো একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয়। কিন্তু শুধু শুনতে ভালো লাগে বলেই তা সংলাপ হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। একইভাবে শব্দের মারপ্যাঁচ ও উদ্দেশ্যহীন দীর্ঘ অপ্রাসঙ্গিক আলাপ-আলোচনা কাহিনির স্বাভাবিক গতি ব্যাহত করে দর্শকের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাগাড়ম্বরের মধ্য দিয়ে নাটকীয়তা সৃষ্টির চেষ্টা এবং কঠিন ও জটিল শব্দের জটাজাল বিস্তার করে সাময়িক চমক সৃষ্টি করা যেতে পারে কিন্তু সামগ্রিকভাবে কাহিনি বিন্যাসের ক্ষেত্রে এসব অসংলগ্ন কথোপকথনের কোনো গুরুত্বই যদি না থাকে, তবে তা সংলাপ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে না।

সংলাপের প্রবহমানতা

গল্প-উপন্যাসে তো বটেই, চলচ্চিত্রে ও টেলিভিশন নাটকে সংলাপ অনায়াসে পাঠ বা উচ্চারণযোগ্য হতে হবে। চরিত্র অনুসারে সংলাপ উচ্চারণে ভিন্নতা অবশ্যই থাকবে, তবে প্রত্যেক চরিত্রের জন্যই তা সাবলীল এবং গতিময় হওয়া প্রয়োজন। কাহিনি বা চরিত্র নির্মাণের বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া সংলাপ যদি দ্বিধাগ্রস্ত খটমটে এবং কষ্টকল্পিত হয়, তবে তা দর্শকের মনোযোগ বিঘ্নিত করে।

সংলাপ রচনার সময় প্রবহমানতা বজায় রাখার জন্য তিনটি সাধারণ বিষয় মনে রেখে লিখলেই চলবে। প্রথমত একটি চরিত্র থেকে পরবর্তী চরিত্রের সংলাপে যাবার সময় সংলাপের দৈর্ঘ্য ছোট-বড় করে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত সংলাপকে চরিত্রের বিভিন্ন কাজ বা অ্যাকশনের সাথে যুক্ত করতে হবে। তৃতীয়ত সংলাপের ক্লান্তিকর একঘেয়েমি কাটাবার জন্য দুটি সংলাপের মাঝে সামান্য সময়ের বিরতি বা নৈঃশব্দ্য ব্যবহার করা যায়। এ ছাড়া সংলাপের ফাঁকে কাহিনির পরিবেশ থেকেই কানে আসে, এমন নানা ধরনের শব্দ–যেমন দূরে রেলগাড়ি চলে যাবার শব্দ বা রাস্তায় ফেরিওয়ালার 'শিশি-বোতল, পুরোনো খবরের কাগজ...' হাঁক যুক্ত করে পুরো কথোপকথনের ভেতরে নতুন আবহ সৃষ্টি করা সম্ভব।

চরিত্রের কাজ ও চলাফেরা বা অ্যাকশনের সাথে মিলিয়ে সংলাপ রচনার চমৎকার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের একটি গল্প থেকে।

১. হালকা নীল রঙের শাড়ির আঁচল দিয়ে বই মুছতে মুছতে মনোয়ারা বলে, 'কখন থেকে বলছি জানালা বন্ধ কর, জানালা বন্ধ কর! রানা আসুক মজাটা বুঝবি।' মিলি খুব মনোযোগ দিয়ে আব্বাস পাগলার একটানা ধ্বনিকে শব্দে ভাগ করার চেষ্টা করে।

২. ভেতরের বারান্দা থেকে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকল মিলির বড় ভাই, এরই নাম রানা। ঢুকেই বলল, 'চিরুনিটা দেখি।'

৩. রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে মনোয়ারা মিলিকে ডাকে, 'হাতে হাতে কাপ-পিরিচগুলো ধুয়ে ফেল তো।'

৪. গুড় মাখানো টোস্টে কামড় দিতে দিতে মিলি ফের জানালা খুলতে গেলে রানা বলে, 'খুলিস না।'

৫. খাটের নিচে থেকে টুল টেনে নিয়ে মিলি বসলে আব্বাস পাগলা বলে, 'রানা কৈ? রানায় আহে নাই?'

৬. 'ভাইয়ার কি আসার কথা ছিল?' আব্বাস পাগলার বহু আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটি নিয়ে আসতে পারলে ভালো হতো ভেবে মিলি চঞ্চল হয়ে ওঠে, 'ভাইয়ার কিছু নিয়ে আসার কথা ছিল? কী?'

৭. 'আরে কত মানুষ তো কত কিছু আনে।' অন্য কোণে একটি বিছানার দিকে আব্বাস পাগলা আঙুল দ্যাখায়, 'দশ নম্বরে এই আপেল আইতাছে, আঙুর আনে, স্যুপ হরলিকস, হাবিজাবি কত কী খায়।'

[মিলির হাতে স্টেনগান: আখতারুজ্জামান ইলিয়াস]

সংলাপ সংক্ষিপ্ত হতে হবে

দৃশ্য মাধ্যমে সংলাপ যতটা সম্ভব ছোট করে লিখতে হবে। যে কথা তিনটি বাক্যে লেখা যায়, তার জন্য পাঁচটি বাক্য ব্যবহার অতিশয়োক্তি। তার চেয়ে কম, অর্থাৎ একটিমাত্র বাক্যে বলতে পারলে তার জন্য তিনটি বাক্যের প্রয়োজন নেই। যদি শুধু চোখের একটি ইশারায় অথবা কাঁধের একটি ঝাঁকুনিতে কাজ চলে যায়, তাহলে বৃথা বাক্য ব্যয়ের চেয়ে তা অবশ্যই ভালো।

মরিয়ম মাথায় কাপড় টেনে দিয়ে দরজা খুলে দাঁড়ালেন। রাজাকারদের একজন বললে, 'পুরুষ মানুষ কেউ নেই?'

মরিয়ম বললেন, 'অফিসে বেরিয়ে গেছে, কী চাই কী?'

'আপনাদের ঘরের পাশে একটা লাশ পড়ে আছে।'

'সে তো সকাল থেকেই দেখছি।'

'থানায় খবর দেয়া হয়েছে?'

'কে খবর দেবে, আমাদের তেমন লোকজন নেই।'

রাজাকারদের একজন ছিল ছোকরা বয়সের। সে বললে, 'কখন থেকে দেখছেন লাশটা?

'সকালে জানালা খোলার পর থেকেই।'

'এতক্ষণ ধরে পড়ে আছে, অথচ কোথাও একটা খবর দিলেন না আপনারা?'
মরিয়ম চটে গিয়ে বললেন, 'সে দায়িত্ব তো বাবা তোমাদের। বাড়ির মানুষজনদের তো আরো কাজ আছে, অফিস-আদালত আছে। এসব করার সময় কোথায়?'

[বেওয়ারিশ লাশ: মাহমুদুল হক]

অনেকেই আপত্তি তুলতে পারেন, সংক্ষিপ্ত সংলাপ তো বাস্তবানুগ নয়। প্রকৃতপক্ষে বাস্তবের পৃথিবীতে অকারণে নানা অপ্রয়োজনীয় শব্দ ব্যবহার না করে একটি বিষয় সঠিকভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা খুব কম মানুষেরই থাকে। তা ছাড়া বাস্তব জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার সময়ের ওপর চলচ্চিত্রের পর্দার দৃশ্যের মতো সময়ের কঠিন কঠোর নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই সচরাচর অহেতুক প্যাঁচাল দিয়ে পূর্ণ বাস্তবের দৃশ্যের ভেতরে বসবাস করা মানুষ দীর্ঘ অপ্রয়োজনীয় কথা শুনতেই অভ্যস্ত। নাটক-সিনেমায় দর্শকের হাতে অফুরন্ত সময় নেই। কাজেই বাস্তবের বিপরীতে ভালো সংলাপের সুনির্বাচিত বাক্যগুলো দর্শকের কাছে শুধু গ্রহণযোগ্য নয়, তা বাস্তবানুগ বলেও মনে হয়। সংলাপ কখনো কখনো অনতি-দীর্ঘ থেকে অতি দীর্ঘও হতে পারে। তবে তা অবশ্যই চরিত্রের প্রকাশ ভঙ্গি, তার মানসিক অবস্থা, বিবৃত ঘটনার গুরুত্ব প্রকাশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

চরিত্রগুলোর কথা বলায় ভিন্নতা থাকবে

উপন্যাসে-নাটকে এবং চলচ্চিত্রে প্রত্যেক চরিত্রই একক ও অদ্বিতীয়। তাদের প্রত্যেকের চেহারা যেমন ভিন্ন, তাদের চিন্তাভাবনাও ভিন্ন। সংগত কারণে তাদের বাক্যালাপের ঢং, উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গিও আলাদা। ফলে প্রত্যেক চরিত্রকে দিয়ে তাদের নিজস্ব সংলাপ বলিয়ে নেওয়ার আগেই ভাবতে হবে কথার মধ্য দিয়ে যেন তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়। পর্দায় উপস্থিত প্রতিটি চরিত্রকে দিয়ে ভিন্নভাবে কথা বলিয়ে নেওয়ার দক্ষতা অর্জনের আগেই লেখক যদি চরিত্রের মুখে সংলাপ ধরিয়ে দেন আর প্রত্যেকে একই সুরে কথা বলতে থাকে, তাহলে দর্শক সহজেই রচয়িতার দুর্বলতা ধরে ফেলতে পারে। 'সব শেয়ালের এক রা' প্রাণিজগতে খুব স্বাভাবিক হলেও মানুষের পৃথিবীতে তা বড়ই বেমানান। ফলে টেলিভিশন বা চলচ্চিত্রের দর্শক সংগত কারণেই কথোপকথনে ভিন্নতা আশা করে। একটি গল্প থেকে উদাহরণ দেওয়া যাক।

পায়ে চলা পথের শেষ প্রান্তে বাঁশের বেড়া এবং গাছপালা দিয়ে ঘেরা চত্বরের এখানে-সেখানে গোটা কয়েক হারিকেন টিম টিম করে জ্বলছে। আধো অন্ধকারে বুঝলাম এখানে একই সাথে সিএলপিডির অফিস এবং স্থানীয় কর্মকর্তা কর্মচারীদের থাকার ব্যবস্থা আছে। পরিচিতি পর্ব শেষ হবার সাথে সাথে লোকাল ম্যানেজার আবু বকর বেশ

বিনয়ের সাথে বললেন, 'আপনেগেরে দুই চার দিন এখানে বেশ কষ্টই হবেনে।'
মুন্না দ্রুত উত্তর দিল, 'না না কষ্ট কিসের।'
'মানে এই থাকার কষ্ট, খাওয়া দাওয়ার কষ্ট...এই আরকি। আপনেগেরে তো চরে থাকার অভ্যাস নাই!'

নাজিম ভাই বেশ গম্ভীর গলায় বললেন, 'আপনার কোনো চিন্তা করতে হবে না। আমরা এখানে কষ্ট করতেই এসেছি, বেড়াতে আসিনি।'

এবারে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নজরুল গনি আবু বকরকে মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, 'নো মোর ফরমালিটিজ। এই সব ফরমালিটির দরকার নাই বকর–এখন ওনাদের থাকার ঘরগুলা দেখায়া দাও আর খাওয়াদাওয়ার কী ব্যবস্থা করছ– মফিজরে টেবিলে খাবার দিতে বলো।' বিনয়ের দিক থেকে আমাদের দলে সমীরণ সবার উপরে। সে বলল, 'আপনাদের ব্যস্ত হবার দরকার নেই। এসে যখন পড়েছি, ব্যবস্থা একটা হবেই।'

'ব্যবস্থা তো এমনিতে হবে না, করতে হবে। হাউএভার–ইয়াংম্যান গেট রেডি ফর দ্য হাম্বল ডিনার ইন দ্য রিমোট স্যান্ডবার।'

[অগ্নিকাণ্ড ও একটি ভেড়া: ফরিদুর রহমান]

চরিত্রের মুখে ভাষার জোগান দেবার আগেই ভাবতে হবে যিনি কথা বলছেন তিনি কে? খিটখিটে মেজাজের বৃদ্ধ বাড়িওয়ালা এবং প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা তরুণ ফুটবলার নিশ্চয়ই একই ভাষায় কথা বলবে না। সদ্য প্রেমে পড়া উনিশ বছর বয়সের তরুণী এবং উনপঞ্চাশ বছর বয়সের অঙ্কের শিক্ষিকার ভাষা এবং কথা বলার ধরন নিশ্চয়ই ভিন্ন হবে।

একটি বিশেষ দৃশ্যে চরিত্রটি কার সাথে কথা বলছে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রধান নির্বাহী যখন গ্রামের হতদরিদ্র কৃষকের সাথে কথা বলেন, তখন এবং সেই একই ব্যক্তি যখন দাতা সংস্থার প্রতিনিধির সাথে কথা বলেন, তখন তাঁর শব্দ চয়ন, বাক্যবিন্যাস, কণ্ঠস্বরের ওঠানামা, এমনকি বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বা শরীরের ভঙ্গি কীভাবে পাল্টে যায়, তা থেকে সংলাপ লেখক কিছু বাস্তব ধারণা অবশ্যই পেতে পারেন।

প্রতিটি চরিত্র আবার তাদের পেশা, শৈশব কৈশোরে অর্জিত শব্দভাণ্ডার এবং প্রাত্যহিক জীবনযাপন থেকে নানা ধরনের শব্দ, বাক্য, উপমা, বাগ্‌ধারা এবং নানা আঞ্চলিক শব্দ ও প্রবাদ-প্রবচন তাদের কথোপকথনে ব্যবহার করে থাকে। শহরে চলাচল করা বাসের কন্ডাক্টর এবং অফিস ফেরত একজন শিক্ষিত যাত্রীর কথা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনলে সহজে এই পার্থক্য লক্ষ করা যাবে।

আর্থিক ও সামাজিক অবস্থানভেদেও চরিত্রের ভাষা বদলে যায়। সত্যজিৎ রায় লিখেছেন, 'মানুষে মানুষে শ্রেণিগত পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাষায়ও পার্থক্য এসে পড়ে। সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি বাংলা ভাষায় ইংরিজি মিশিয়ে কথা বলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর কেউ কেউ ইংরেজি শব্দ বর্জন করা অভ্যাস করছেন, কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় নগণ্য। শিক্ষিত বাঙালির সংলাপে ইংরেজি কথার ব্যবহার তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক।'

সংলাপে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার

আঞ্চলিক ভাষায় পরিবেশিত সংলাপ একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষের কথোপকথনের ধরনই শুধু নয়, তাদের মেজাজ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও জীবনযাপনের নানা বিষয় ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষভাবে নির্বাচিত কোনো এলাকার সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা সংলাপে ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট উপভাষায় দক্ষতা থাকা আবশ্যক। একজন চিত্রনাট্যকার বা পরিচালকের পক্ষে দেশের সকল অঞ্চলের ভাষা রপ্ত করা এবং সেই ভাষায় সংলাপ রচনা করা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে প্রমিত ভাষায় লিখিত সংলাপ পরবর্তী পর্যায়ে সেই বিশেষ আঞ্চলিক ভাষায় অভিজ্ঞ কারো সহায়তায় রূপান্তর করা যেতে পারে। শুধু হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার এবং কোনো অঞ্চলের মানুষের কথ্য ভাষাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সংলাপে আঞ্চলিকতার প্রয়োগ কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

সন্ধ্যায় সালিশ বসে মণ্ডলদের খলায়। মণ্ডল পোড়াকে বলে, 'সত্যি করে কবু, তুই কী দেখিছু?' পোড়া গড়গড় করে বলে দেয়, 'তোমাগেরে গোয়ালের মদ্যে মালেক মোমেনার সাথে খারাপ কাম করিছে।'

ভিড়ের মধ্যে থেকে সাইদুর লাফিয়ে ওঠে, 'তুই দেখিছু?'
'হয়।'

'ক্যাংকা করে? তুই কি গোয়ালের মদ্যে সান্দাছিলু?'
'না। ভুলকি দিয়ে দেখিছুঁ।'
'ক্যা? গোয়ালের মদ্যে তুই ভুলকি দিবার গেলু কী জন্যে?'
'ফুসুরফাসুর শব্দ শুনে। গোয়ালের আগ দিয়ে যাবা লাগিছুঁ, হটাৎ শুনবা পানু গোয়ালের মদ্যে ফিসফাস। মনে মনে কনু কী ব্যাপার? চোরেরা গরু চুরি করবা অ্যাচে নাকি? তাই ভুলকি দিনু। ভুলকি দিয়ে দেখনু...।'
মণ্ডল জিজ্ঞেস করে, 'কী দেখলু?'
'কওয়া যাবে না। শরমের কতা।'

'তোর কিসের শরম রে? দুই দিনের চ্যাংরা, শরমের কী বুঝিস তুই? ক কী দেখলু?'
'দেখনু মালেক আর মোমেনা জাপটাজাপটি করোছে।'

[মোমেনার গল্প : মশিউল আলম]

ত্রুটিহীন আঞ্চলিক ভাষায় সুলিখিত সংলাপ এবং একই সাথে অভিনয়ের ক্ষেত্রে সেই সংলাপে আঞ্চলিক ভাষার যথাযথ প্রয়োগ যে ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি করে, তার কোনো তুলনা নেই। শুধু সংলাপের কারণে একেকটি চরিত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়, চরিত্রটি হয়ে ওঠে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যেসমৃদ্ধ গতানুগতিকতার বাইরে এক অদ্বিতীয় মানুষ।

সংলাপে গতানুগতিকতা বর্জন

সংলাপ রচনায় সচেতনভাবে গতানুগতিকতা বর্জন করতে হবে। যাত্রা থিয়েটার, মঞ্চনাটক এবং পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের বাংলা সিনেমায় এবং বিপুলসংখ্যক হিন্দি সিনেমায় বহু ব্যবহারে জীর্ণ একধরনের সংলাপের ছড়াছড়ি লক্ষ করা যায়।

অতীতের কোনো জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের উদাহরণ থেকে উৎসাহিত হয়ে কিংবা তারকাচিহ্নিত অভিনেতাদের মুখে শোনা চটুল বাক্য অনুসরণ করে রচিত এসব ছকে বাঁধা সংলাপ চিত্রনাট্যের দুর্বলতা প্রকটভাবে তুলে ধরে। আলোচিত অতি ব্যবহারে বিনষ্ট সংলাপের উদাহরণ আমাদের দেখা অসংখ্য ছবিতে ছড়িয়ে আছে।

ক. দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর একটি দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাবার সময়, 'তাহলে ঐ কথাই রইলো...'

খ. মা-হারা মেয়ের বিয়ের প্রস্তুতি পর্যায়ে বাবার সংলাপ, 'আজ যদি তোর মা বেঁচে থাকতো...'

গ. সিনেমায় একটি দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত পর্যায়ে নায়িকার পিতার উদ্দেশ্যে নায়কের সংলাপ, 'চৌধুরী সাহেব আজ অর্থবিত্ত ক্ষমতার মোহে আপনি অন্ধ হয়ে গেছেন। কিন্তু মনে রাখবেন গরিব হলেও আমরা মানুষ।'

শুধু গতানুগতিক সংলাপ একটি ভালো কাহিনির বিনাশ ঘটাবার জন্য যথেষ্ট। সেই কারণে, বর্তমানে প্রচলিত নয়, এমন সব সেকেলে শব্দ, বাক্য বা বাক্যাংশ, ক্রিয়াপদ, উপমা, প্রতীক ও অলংকার সতর্কতার সাথে এড়িয়ে চলা দরকার।

কথোপকথনের মধ্য দিয়ে একটি অজ্ঞাত চরিত্র, কাহিনির সূচনালগ্নের একজন অপরিচিত মানুষ ক্রমেই দর্শকের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেন। এই বিবেচনা থেকে বলা যায়, সংলাপ অপ্রকাশিত মানব-মানবীর প্রকাশিত প্রতিবিম্ব। ব্যক্তির অতীত, শিক্ষা, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এবং পেশাসহ অভ্যন্তরীণ চিন্তাচেতনার প্রতিফলন ঘটে তার কথায়। কাজেই সংলাপের বিন্যাস ও কাঠামো, শব্দচয়ন, ছন্দ

ও গতি এবং প্রকাশভঙ্গি চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া কথা রচনার প্রধানতম পূর্বশর্ত। সংলাপের গুরুত্ব অনুধাবনের পাশাপাশি সতর্ক পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় অনুশীলনের মধ্য দিয়ে রচিত বাস্তবানুগ এবং আকর্ষণীয় কথোপকথন একটি সাধারণ মানের গল্পকেও অসাধারণ চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত করতে পারে।

তথ্যসূত্র

১. The Art of Dramatic Writing: Lagos Egri, Simon and Schuster
২. Writing for Visual Media: Anthony Friedmann, Focal Press
৩. বিষয় চলচ্চিত্র: সত্যজিৎ রায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪. নাট্য প্রযোজনা ও পরিচালনা: ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং
৫. The Film Director's Team: Silman-James Press
৬. http://rvananderson.com/writing-on-the-nose-what-it-is-and-why-not-to-do-it
৭. https://www.scriptreaderpro.com/script-dialogue

লেখক পরিচিতি

ফরিদুর রহমান : লেখক, চলচ্চিত্র গবেষক ও নির্মাতা।

সিগন্যাল এবং অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে সিগন্যালের ব্যবহার

পঙ্কজ পালিত

আমাদের দৈনন্দিন তথা প্রাত্যহিক জীবনে 'সিগন্যাল' হচ্ছে বহুল ব্যবহৃত এবং ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটি শব্দ, যা আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায়শ প্রয়োগ করে থাকি। মূলত 'সিগন্যাল' বলতে আমরা বুঝি একটি সংকেত, যা প্রচলিত টেলিফোন থেকে সাম্প্রতিক কালের মোবাইল ফোন, রাস্তায় যানবাহন চলাচল থেকে শপিং মল, সংগীত থেকে কম্পিউটার, বেচাকেনা বা বাণিজ্য থেকে ব্যাংকে হিসাব সংরক্ষণ, সংস্কৃতিচর্চা থেকে পণ্যের বিজ্ঞাপন, শিক্ষা থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞান, গবেষণা থেকে আবিষ্কার, বিনোদন তথা টেলিভিশন থেকে চলচ্চিত্র, দৈনন্দিন চলমান সংবাদ থেকে ইন্টারনেট-ফেসবুকের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদানসহ সমস্ত কার্যে এই সিগন্যাল বা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হওয়ার কারণে এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে ডিজিটাল প্রযুক্তির উদ্ভাবন, উৎকর্ষের বিকাশ এবং সব ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য বলে প্রমাণিত হওয়ার পর বিশেষ করে মোবাইল ফোন, ডিজিটাল ক্যামেরা ও কম্পিউটার–এই তিনটি ইলেকট্রনিক সামগ্রী একেবারে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত অন্যান্য অতীব প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সাথে একই সারিতে জায়গা করে নিয়েছে।

ইতিপূর্বে তথা আশির দশকের পুরো সময়টা জুড়ে অ্যানালগ প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার এবং প্রচলনে অভ্যস্ত ব্যবহারকারীরা এই নতুন প্রযুক্তিকে এমতাবস্থায় খুব একটা সাদরে আহ্বান কিংবা গ্রহণ না করলেও ডিজিটাল প্রযুক্তিটি তার পদ্ধতিগত চরম উৎকর্ষ প্রদর্শনের মাধ্যমে খুবই দ্রুততার সাথে প্রচলিত অ্যানালগ প্রযুক্তিকে পেছনে ফেলে সেই জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হয়ে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে নিয়েছে। আমরা দেখেছি, অ্যানালগ প্রযুক্তিতে তথ্য সংরক্ষণ, সিগন্যাল প্রেরণ ও গ্রহণ উভয় দিকগুলো অত্যন্ত ব্যয়বহুল, কষ্টসাধ্য এবং ত্রুটিযুক্ত বলে প্রমাণিত হওয়ার কারণে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে তৈরি সিগন্যালসমূহ সমরূপ বা প্রযুক্তিগতভাবে সমধারায় সমন্বিত হওয়ার কারণে, তথ্য-উপাত্তসমূহ সংরক্ষণ, আদান-প্রদান কিংবা প্রেরণ বা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো বিঘ্ন তৈরি বা বিকৃতিকরণ কিংবা কখনো 'নয়েজ' (noise)

সৃষ্টি বা অন্য কোনো দোষে আক্রান্ত হয়ে উপাত্তসমূহ নষ্ট বা হারিয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা একেবারে থাকে না বললেই চলে। পর্যালোচিত সমীক্ষায় দেখা যায়, ইদানীংকালে তথা সাম্প্রতিক সময়ে ব্যবহৃত সমস্ত ইলেকট্রনিক ডিভাইসে ব্যবহৃত ডিজিটাল সিগন্যালসমূহ, যা shape বা গঠনকৃত আকৃতিতে কিংবা অ্যামপ্লিচ্যুড (amplitude) বা বিস্তৃতিকরণের ক্ষেত্রে একেবারে সমপর্যায়ভুক্ত বা অক্ষুণ্ন থাকার কারণে তথ্য-উপাত্তসমূহ সংরক্ষণ, প্রেরণ, গ্রহণ, ব্যবহার কিংবা সম্প্রচারের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে এই সিগন্যালের প্রযুক্তিগত সুবিধাদি অ্যানালগ সিগন্যালের তুলনায় অনেক নির্ভরতার সাথে গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি, ডিজিটাল রেকর্ডিং প্রযুক্তি উদ্ভাবন পূর্বে অ্যানালগ প্রযুক্তিসংবলিত পদ্ধতিতে সমস্ত রেকর্ডিং তথা সংরক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতো। এই পদ্ধতিতে ইলেকট্রিক্যাল (electrical) সিগন্যাল পরিবর্তনের মাধ্যমে আলো ও শব্দের পরিবর্তিত উপস্থাপনা তৈরি হতো। অ্যানালগ প্রযুক্তি অনুসৃত রীতিতে রেকর্ডিং খুবই উন্নত ও উচ্চমানসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও এই সিগন্যালটি অব্যাহতভাবে ব্যবহৃত কিংবা ব্যবহারোপযোগী সিগন্যাল হিসেবে সমাদৃত হয়ে উঠতে পারেনি। কেননা, অ্যানালগ সিগন্যাল থেকে পরবর্তী কপি বা অনুলিপি তৈরি কিংবা সম্প্রচারকালীন সময়েও ত্রুটিযুক্ত পদ্ধতির কারণে সমূহ বিঘ্ন এবং বিপত্তি ঘটত, যাতে ইমেজ এবং শব্দ উভয় ক্ষেত্রেই গুণগত মানের অবনতি একটি অপরিহার্য ত্রুটিজনিত সীমাবদ্ধতা বলে বিবেচিত হতো।

এমনই এক ক্রান্তিলগ্নে অ্যানালগ প্রযুক্তি থেকে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে উত্তরণ, একটি নতুন যুগের সূচনা করল। ইতিপূর্বে অ্যানালগ প্রযুক্তিতে দৃশ্যমান সমস্ত অসংগতি তথা তথ্য-উপাত্তসমূহের দৃশ্যমান বিচ্যুতি এবং বিঘ্ন সৃষ্টিকারী সমস্ত প্রতিকূলতা দূরীভূত হয়ে যাওয়ার কারণে সিগন্যাল সংরক্ষণ, সম্প্রচার, সঞ্চালন, নির্মাণ কিংবা প্রেরণকার্যে ডিজিটাল প্রযুক্তি যুক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হলো। সব ক্ষেত্রেই এই প্রযুক্তি ত্রুটি-বিমুক্ত অতি সহজ, অনেক নির্ভরযোগ্য এবং অর্থসাশ্রয়ী বলেই এক অভাবনীয় গ্রহণযোগ্যতার মাধ্যমে এই সিগন্যালটির গুরুত্ব ক্রমেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

অ্যানালগ প্রযুক্তি থেকে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে উত্তরণ

আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে নব্বইয়ের দশকের পূর্বাবধি অডিও-ভিজ্যুয়াল (audio-visual) মাধ্যমে সমস্ত অডিও কিংবা ভিডিও প্রোডাকশনগুলো একেবারে অ্যানালগ পদ্ধতিতে অনুসৃত রীতি বা প্রথা অনুযায়ী অ্যানালগ ভিডিও টেপ (analog video tape) এবং অ্যানালগ রেকর্ডারের (analog recorder) মাধ্যমে সম্পন্ন

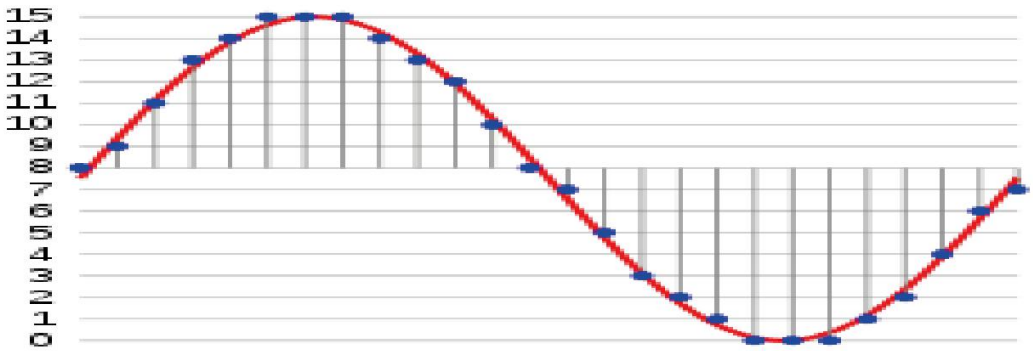

হতো। পরবর্তী সময়ে ডিজিটাল প্রযুক্তির উদ্ভাবন, প্রচলন, উন্নয়ন, প্রসার এবং ব্যবহার এত দ্রুতলয়ে সর্বস্তরে ব্যাপ্তি ঘটাল যে এত দিন ধরে প্রচলিত সেই অ্যানালগ প্রযুক্তিগত পদ্ধতিটি কৌশলগতভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তির তুলনায় অনেকটা পিছিয়ে থেকে একসময় একেবারে স্থবির এবং পর্যায়ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

বস্তুত অডিও-ভিজ্যুয়াল (audio-visual) মাধ্যমে আমরা দুই ধরনের সিগন্যালের অস্তিত্ব বা ব্যবহার দেখতে পাই, যার মধ্যে একটি হচ্ছে অ্যানালগ (analog) এবং অন্যটি ডিজিটাল (digital)। অ্যানালগ ও ডিজিটাল উভয় সিগন্যালই নিঃসন্দেহে যথেষ্ট কার্যকরী এবং বহুল ব্যবহৃত সিগন্যাল হওয়া সত্ত্বেও উভয় সিগন্যালের গঠনপ্রণালি এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগত অনেক পার্থক্য রয়েছে, যা উভয় সিগন্যালের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট বিভাজন তৈরি করে দিয়েছে।

অ্যানালগ সিগন্যাল হচ্ছে অবিচ্ছিন্নভাবে ধারাবাহিক একটি বৈদ্যুতিক সিগন্যাল, অপর দিকে ডিজিটাল সিগন্যাল হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন এবং স্বতন্ত্র একটি বৈদ্যুতিক সিগন্যাল। অ্যানালগ সিগন্যাল সাধারণত সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত বা পরিবর্তনযোগ্য একটি সিগন্যাল, এমনকি অবৈদ্যুতিক সিগন্যালের ক্ষেত্রেও একই রকম পরিবর্তনগুলো সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

অপর দিকে ডিজিটাল সিগন্যালের সাথে অ্যানালগ সিগন্যালের পার্থক্য নির্ণয় করতে গেলে দেখা যায় যে ডিজিটাল সিগন্যালগুলো প্রতিটি ধাপে বা স্তরে (step) পরিবর্তিত হয়ে স্পন্দন বা pulse অনুযায়ী সংখ্যার ভিত্তিতে গঠিত হয়ে থাকে। আর অ্যানালগ সিগন্যাল হচ্ছে প্রকৃত সংখ্যার একটি আদর্শিক প্রতিরূপ এবং শব্দের ক্ষেত্রে কণ্ঠস্বরের তীব্রতাহেতু বিদ্যুৎ-প্রবাহেও এর পরিবর্তন ঘটে থাকে।

সমীক্ষায় দেখা যায়, ডিজিটাল সিগন্যালের আছে স্বতন্ত্র সীমা বা পরিধি এবং প্রতিটি স্পন্দনের (pulse) আছে নির্দিষ্ট মূল্যমান (value), যা পরবর্তী সংখ্যাটির পরিবর্তন না ঘটা পর্যন্ত অক্ষুণ্ন বা অপরিবর্তিত থাকে। এখানে দুটি অ্যামপ্লিচ্যুড লেভেল (amplitude level) বা বিস্তৃতিকরণ মাত্রা কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে, যা

০ কিংবা ১, সত্য বা মিথ্যা (true/false) উঁচু বা নিচু (high/low), এই প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়ে থাকে, যা নোডস (nodes) নামে পরিচিত।

অ্যানালগ প্রযুক্তিতে রেকর্ডিং এবং এর সীমাবদ্ধ কর্মক্ষমতা

অ্যানালগ পদ্ধতিতে রেকর্ডিংয়ের ক্ষেত্রে ভিডিও কিংবা অডিও, অর্থাৎ ইমেজ ও শব্দ উভয় ক্ষেত্রেই সিগন্যালসমূহ অবিচ্ছিন্ন ও অবিরতভাবে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পরিবর্তনের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্তগুলো উপস্থাপিত হয়ে থাকে। যদিও ভিডিও ও অডিও (video & audio) ধারণের জন্য সে সময় অনেকগুলো অত্যন্ত উন্নত মানের অ্যানালগ প্রযুক্তির টেপ-রেকর্ডার (tape-recorder) ব্যবহারের প্রচলন ছিল, তবু অ্যানালগ পদ্ধতিতে রেকর্ডকৃত তথ্য-উপাত্তের ক্ষেত্রে অনেকগুলো ত্রুটিযুক্ত অসংগতি বা drawbacks পরিলক্ষিত হতো, যা কোনোভাবেই পরিহার করা যেত না।

সমীক্ষায় দেখা যায়, যেকোনো রেকর্ডিং সিস্টেমে ব্যবহৃত ইলেকট্রনিকস (electronics) উপাদানসমূহ এবং রেকর্ডিংয়ের জন্য মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত অডিও বা ভিডিও টেপগুলো (audio & video tapes) যেকোনো রেকর্ডিং কার্যে ব্যবহৃত হোক না কেন, এগুলো কখনো ত্রুটি-বিমুক্ত মাধ্যম ছিল না। এই মাধ্যমে ধারণকৃত উপাত্তগুলোতে অনেকগুলো দৃশ্যমান ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হতো, যা ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ (background noise) বা (visual artifacts) নামে পরিচিত ছিল। তেমনিভাবে ইমেজের ক্ষেত্রে এটি 'ইলেকট্রনিক নয়েজ' (electronic noise) হিসেবে দৃশ্যমান হতো, যাকে grain বা snow বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। মূলত এই নয়েজের কারণে ইমেজের কোয়ালিটি বা গুণগত মান হ্রাস পেত বা অবনতি ঘটত। অনুরূপভাবে শব্দ ধারণের ক্ষেত্রেও শব্দের মধ্যে নীরবতা উত্তরণকালীন সময়েও একটা নিচু মাত্রার (low level) নয়েজ কর্ণগোচর হতো, যা (hissing sound) নামে পরিচিত। এই কারণে শব্দের ক্ষেত্রেও গুণগত মানের অবনতি ঘটত।

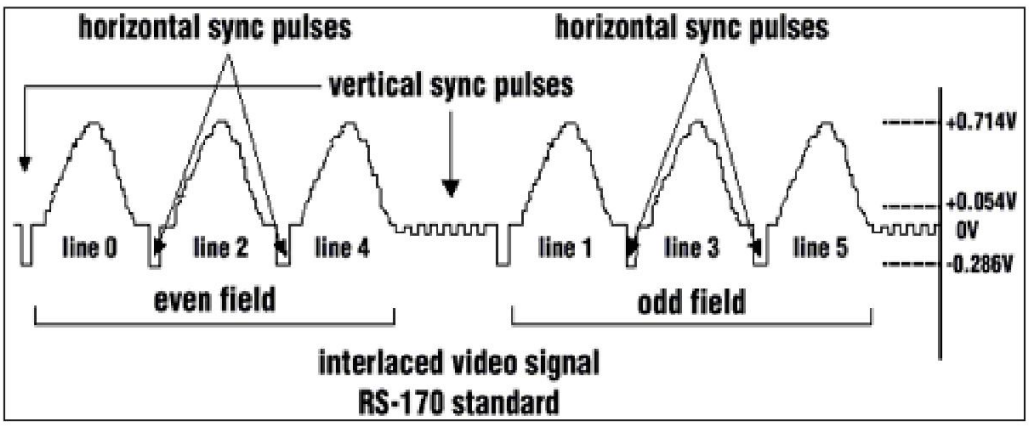

এ ছাড়া অ্যানালগ প্রযুক্তিগত পদ্ধতিতে রেকর্ডকৃত কোনো টেপ (tape) থেকে ইমেজ কিংবা শব্দের অনুরূপ কপি বা প্রতিলিপি তৈরির ক্ষেত্রেও ইলেকট্রনিক নয়েজ (electronic noise) এবং অন্যান্য বিকৃতিকরণের উপাদানগুলো সিগন্যালের সাথে একত্রে পরিলক্ষিত হতো, যা সিগন্যাল প্রজেকশন বা প্রদর্শনকালীন সময়ে বিঘ্ন ঘটাত। এমনকি পর্যায়ক্রমে একটি মূল কপি (মাস্টার কপি) থেকে অনুরূপ কপি বা প্রতিলিপি তৈরি করতে চাইলে সত্যিকার অর্থে প্রতিবারই এই ত্রুটিগুলো যথেষ্ট সমস্যা তৈরি করত, যাকে অপরিহার্যভাবে 'জেনারেশন লস' (generation loss) হিসেবে গণ্য করা হতো।

ডিজিটাল প্রযুক্তিতে রেকর্ডিং এবং এর বিস্তৃত কর্মক্ষমতা

রেকর্ডিং পদ্ধতিতে ডিজিটাল প্রযুক্তি যুক্ত হওয়ার ফলে এক অভাবনীয় এবং যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটল। চলচ্চিত্রকারদের বহুদিনের লালিত স্বপ্ন, নির্মাতাদের অবাধে কাজ করার স্বাধীনতা, চলচ্চিত্রের ওপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, সব মিলিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে কারখানাগত চরিত্র থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়ে গেল।

ডিজিটাল রেকর্ডিংয়ের ক্ষেত্রে প্রতিটি মুহূর্ত থেকে মুহূর্তের ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালের (electrical signal) মাত্রা একটি পরিমাপের ভিত্তিতে প্রতিটি মুহূর্তকে আলাদা এবং স্বতন্ত্র সংখ্যা বা digit-এর মাধ্যমে রেকর্ডিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে।

ডিজিটাল রেকর্ডিংয়ের ক্ষেত্রে যেহেতু ইমেজ এবং শব্দ উভয়েই বাইনারি ডিজিট (binary digit) বা যুগল সংখ্যার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়, সেহেতু রেকর্ডকালীন সময়ে উপাত্তগুলো শুধু on-off স্পন্দনের মাধ্যমে রেকর্ডিং প্রক্রিয়াটি সম্পাদিত

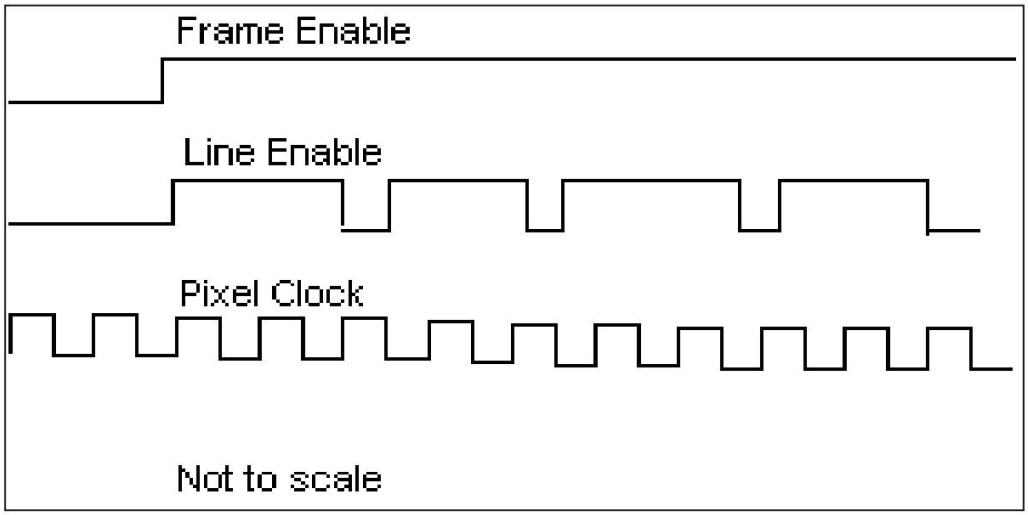

হয়ে থাকে। এ ছাড়া ডিজিটাল উপাত্তসমূহ অত্যন্ত উচ্চমাত্রায় কার্যকর এবং অধিক মাত্রায় সংবেদনশীলতার কারণে এটি অ্যানালগ সিগন্যালের মতো ইলেকট্রনিক বা টেপ-জনিত নয়েজের প্রভাবে কোনোভাবেই প্রভাবিত হয় না বা ইলেকট্রনিক নয়েজকে রেকর্ডকালীন সময়ে গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। আর এই কারণেই একটি ডিজিটাল কপি থেকে যতগুলো অনুরূপ বা প্রতিলিপি তৈরি করা হোক না কেন, এ ক্ষেত্রে ইমেজ কিংবা শব্দের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অসংগতি বা গুণগত মানের অবনতি কিংবা বিকৃতি বা জেনারেশন লস একেবারেই ঘটে না বললেই চলে। এ কারণেই সমস্ত ডিজিটাল কপিকে 'ক্লোনস' (clones) বলা হয়ে থাকে। যেহেতু সংখ্যা তালিকার (digit list) ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে সেই মৌলিক বা original সিগন্যালের অনুরূপ সিগন্যাল কপি খুব সহজেই তৈরি বা সম্পাদন করা যায়, সেহেতু সব ডিজিটাল কপিকে সমগুণগত মানসম্পন্ন ডিজিটাল কপি হিসেবে গণ্য করা হয়।

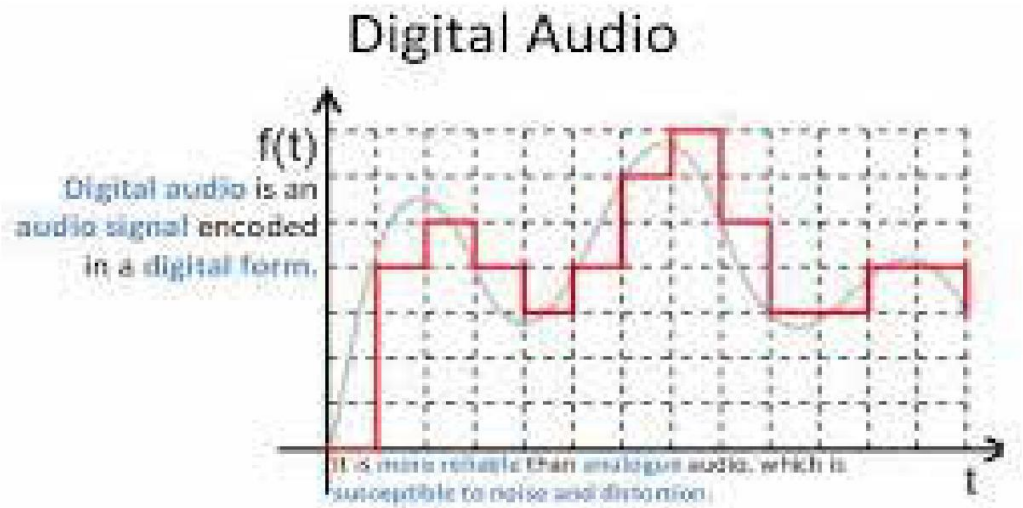

ডিজিটাল রেকর্ডিংয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াটি হচ্ছে, এখানে নিয়মিত বিরতিতে ইমেজ এবং শব্দ উভয় সিগন্যালগুলোকে পর্যায়ক্রমে পরিমাপ করা হয় এবং পরিমাপের পর প্রতিটি স্যাম্পল (sample) বা নমুনাই হচ্ছে সেই মুহূর্তের voltage-এর পরিমাপ, আর এই voltage-এর পরিমাপগুলো পরবর্তী সময়ে সংখ্যায় রূপান্তরিত হয়ে ডিজিটাল ভিডিও টেপ, হার্ডডিস্ক, মেমোরি কার্ড বা ফ্ল্যাশ মেমোরি ডিভাইসে রেকর্ডিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়ে থাকে।

ডিজিটাল প্রযুক্তিতে এই সংখ্যাগুলো আনুক্রমিক শ্রেণিতে ০ এবং ১ বাইনারি কোড (binary code) ব্যবহারের মাধ্যমে স্বতন্ত্র সংখ্যা হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। এখানে প্রতিটি বাইনারি সংখ্যা হচ্ছে একেকটি বিট (bit) এবং ৮টি বিটের সমন্বয়ে

তৈরি হয় একটি বাইট (byte)। এখানে original বা মৌলিক ভোল্টেজটি সংখ্যায় রূপান্তরিত হওয়াকে 'কোয়ান্টাইজিং' (quantizing) বলে। ভিডিও সিস্টেমে প্রতিটি স্যাম্পল বা নমুনা ৮ বিট সংখ্যায় রূপান্তরিত হয়ে থাকে, তবে উচ্চমানসম্পন্ন রেকর্ডিং প্রযুক্তিতে ১০ বিট, ১২ বিট কিংবা ১৬ বিট সংখ্যাও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রতিটি স্যাম্পল বা নমুনার ক্ষেত্রে যত বেশি বিট ব্যবহৃত হবে, সেই ইমেজের এবং শব্দেরও গুণগত মানের তত বেশি ক্রমোন্নতি ঘটবে।

ভিডিও কিংবা অডিও (video/audio) রেকর্ডকালীন সময়েও সিগন্যালসমূহ ডিজিটালে রূপান্তরিত হওয়ার পুরো পদ্ধতিটাকে ডিজিটাইজিং (digitizing) বলা হয়ে থাকে, যা সাধারণ একটি অ/উ (analog to digital) converter-এর মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। এই রূপান্তর প্রক্রিয়াটি ক্যামেরার ক্ষেত্রে ক্যামেরা অভ্যন্তরস্থিত ক্যামেরা ইলেকট্রনিকসের (camera electronics) অংশবিশেষ কিংবা আলাদাভাবে রেকর্ডারসমূহের অংশবিশেষও হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনানুযায়ী ডিজিটাল সিগন্যাল থেকে অ্যানালগ সিগনাল বা মৌলিক অবয়বেও D/A (digital to analog) converter-এর মাধ্যমেও বিনির্মাণ করা যায়।

অ্যানালগ থেকে ডিজিটালে রূপান্তর প্রক্রিয়া

সাধারণত অ্যানালগ সিগন্যাল থেকে ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তর প্রক্রিয়াটি তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয়ে থাকে। প্রথম ধাপটি হচ্ছে সিগন্যাল প্রস্তুতিকরণ বা Signal preparation। দ্বিতীয় ধাপটি হচ্ছে স্যামপ্লিং বা নমুনা বিশ্লেষণ বা পরিমাপ প্রক্রিয়া এবং তৃতীয় ধাপটি হচ্ছে কোয়ান্টাইজেশন বা সংখ্যায় রূপান্তর প্রক্রিয়া। এই ধাপগুলো ক্রমান্বয়ে সম্পন্ন হওয়ার পরই সিগন্যালটি তখন ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তরিত হয়ে থাকে।

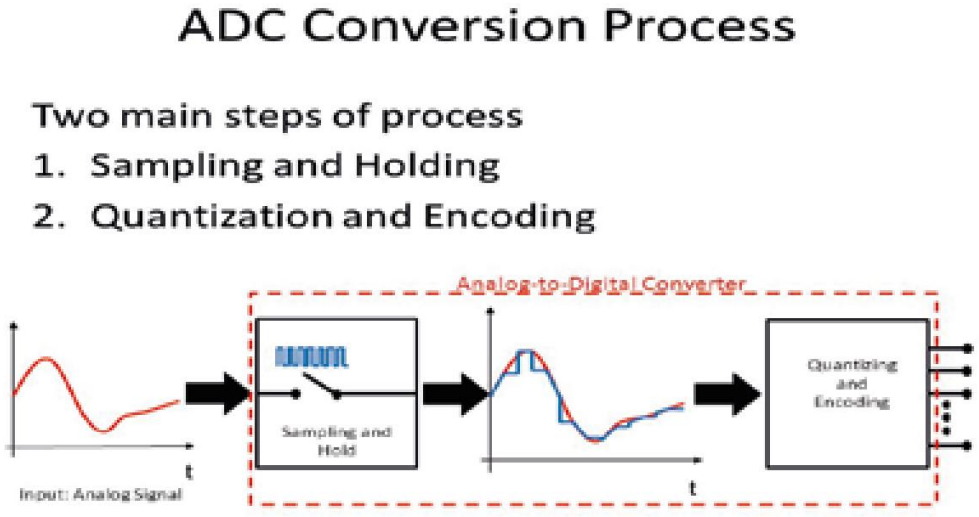

মূলত ডিজিটাল সিগন্যাল হচ্ছে 'মর্স কোড' বা মর্স প্রবর্তিত সাংকেতিক পদ্ধতির সমতুল্য, যা কম্পিউটারে পাঠাবার পর শব্দে অনূদিত হয়ে থাকে। একটি ডিজিটাল সিগন্যাল বা সংকেত, যা ০ এবং ১ সমন্বয়ে গঠিত, তা ফোন লাইনের ভেতর দিয়েও প্রেরণ করা যেতে পারে। যেমন আমরা যদি কম্পিউটারে 'A' অক্ষরটি টাইপ করে অন্যত্র পাঠাই, এই অক্ষরটি ০১০০০০০১ সংখ্যায় রূপান্তরিত হয়ে অন্য কম্পিউটারে প্রবেশকালীন সময়ে আবার অনূদিত হয়ে 'A' অক্ষরে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

এই প্রকার ৮টি ০ কিংবা ১-এর সিরিজকে এক বাইট হিসেবে গণ্য করা হয়, যেখানে সিরিজের প্রতিটি ০ কিংবা ১-কে একেকটি বিট বলা হয়ে থাকে।

অ্যানালগ ও ডিজটাল সিগন্যাল দুটি সম্পর্কে বোধগম্যতা

অ্যানালগ ও ডিজিটাল সিগন্যাল দুটির মধ্যেকার পার্থক্যগুলো নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন তরঙ্গের গতি ও কর্মধারার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই তুলনামূলক একটি বোধগম্যতা আমাদের উপলব্ধিকে আলোড়িত করে।

বিভিন্ন পর্যালোচনা ও সমীক্ষায় আমরা দেখতে পাই যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম অ্যানালগ 'wave form-কে তামার তারের সাথে সংযোগ ঘটিয়ে শব্দ বা বাক্যালাপ প্রেরণের ক্ষেত্রে শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করে তা প্রেরিত হয়েছিল। যেহেতু অ্যানালগ প্রযুক্তিতে রেকর্ডিংয়ের ক্ষেত্রে electro-magnetic wave বা তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের বিকৃতকরণকে আকর্ষণ করার প্রভাবান্বিত হওয়ার প্রবণতা ছিল, সেহেতু অ্যানালগ প্রযুক্তিতে রেকর্ডকৃত তথ্য বা উপাত্তসমূহ, নয়েজের (noise) কারণে প্রেরণ, গ্রহণ, সংরক্ষণ ও সঞ্চালন করা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল।

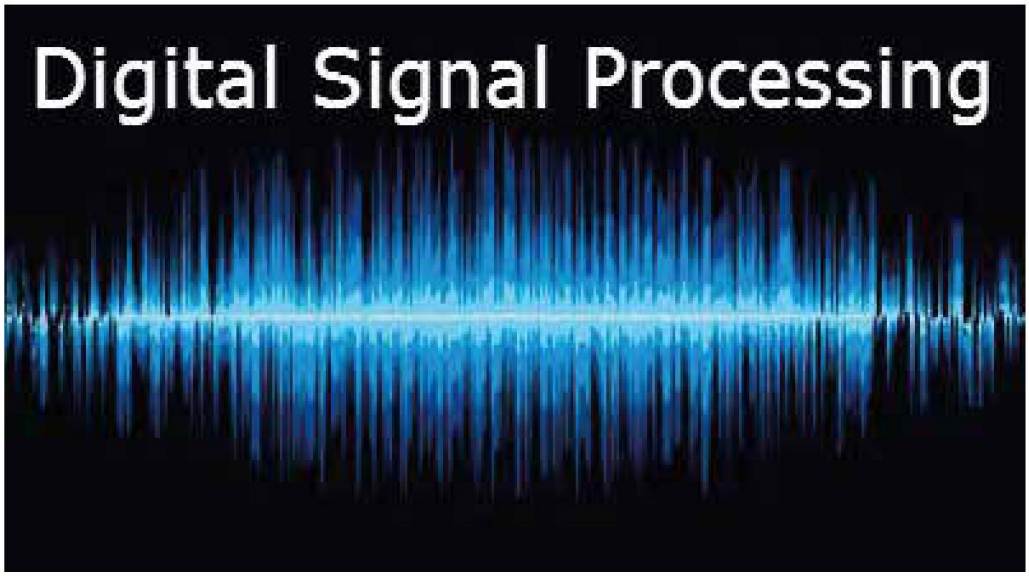

পরবর্তী সময়ে অ্যানালগ প্রযুক্তি থেকে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার পর পূর্বেকার অ্যানালগ প্রযুক্তির সমস্ত অসংগতি তথা তথ্য-উপাত্তসমূহের বিচ্যুতিসহ সঞ্চালন ক্ষেত্রে সমস্ত প্রতিকূলতা দূরীভূত হয়ে যাওয়ার কারণে সম্প্রচার, সংরক্ষণ, গ্রহণ কিংবা প্রেরণ এবং প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও এক নতুন মাত্রা যোগ হয়ে যায়। এ ছাড়া ডিজিটাল প্রযুক্তি অতি সহজ, শতভাগ নির্ভরযোগ্য, শ্রম ও অর্থের সাশ্রয় এবং সব ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিমুক্ত বলেই এর গ্রহণযোগ্যতা সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে আকৃষ্ট করতে সক্ষমতা লাভ করে।

চলচ্চিত্র তথা অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়, আলোচিত, প্রভাবিত এবং গণযোগাযোগের ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত ডিজিটাল প্রযুক্তিটি হচ্ছে একটি অন্যতম মাধ্যম। অডিও-ভিজ্যুয়াল তথা টেলিভিশন, সিনেমা কিংবা চলচ্চিত্র মাধ্যমের প্রতিটি শাখাই হচ্ছে বিজ্ঞানের অবদান এবং বিজ্ঞানীদের নিরলস প্রচেষ্টায় তাঁদের গবেষণাগারেই এই মাধ্যমের উদ্ভব, বিকাশ এবং মানোন্নয়ন ঘটে চলেছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পরপরই এই প্রযুক্তিকে অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে যুক্ত করার এক সর্বাত্মক প্রচেষ্টা শুরু হয়ে যায় সারা বিশ্বজুড়ে সেই নব্বইয়ের দশকে। মূলত সর্বপ্রথম ডিজিটাল প্রযুক্তির আবির্ভাব ঘটে ১৯৮৬ সালে, যখন একটি বিখ্যাত ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এত দিনকার প্রচলিত এবং বহুল ব্যবহৃত অ্যানালগ প্রযুক্তির হাইব্যান্ড (high band) ভিডিও সিগন্যালকে আমূল পাল্টে দিয়ে ডিজিটাল ভিডিও বা ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তরিত করে এক চমক সৃষ্টি করে। সত্যিকার অর্থে এই নতুন সিগন্যালটি উদ্ভাবনের পর অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়ে যায় এবং এরই ধারাবাহিকতায় সর্বপ্রথম 'ইলেকট্রনিক সিনেমাটোগ্রাফি' (electronic cinematography) নামক তত্ত্বটি অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে যুক্ত হয়ে একটি নতুন কৌশল প্রতিষ্ঠার প্রয়াস আমরা দেখতে পাই। এই অদম্য প্রচেষ্টা এবং গবেষণার ফলে ১৯৯৮ সালে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে একটি সত্যিকার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা ঘটে, যখন 'হাই-ডেফিনেশন' (High definition) বা HD নামে অধিকতর কারিগরি প্রযুক্তিতে তৈরি নতুন মাত্রার এক ফরম্যাট ডিজিটাল জগতে প্রবেশ করে। এই নতুন ফরম্যাটটি কারিগরিজনিত কারণে অধিকতর উৎকর্ষ প্রমাণিত হওয়ার ফলে এই প্রযুক্তিকে অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে যুক্ত করে 'ডিজিটাল সিনেমাটোগ্রাফি' (digital cinematography) নামে তত্ত্বটির ভিত প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এক অভাবনীয় তৎপরতা সারা বিশ্বজুড়ে মিডিয়া জগতে আমরা দেখতে পাই।

প্রতিযোগিতার দৌড়ে সিনেমা বা চলচ্চিত্র নির্মাণের একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম তথা ফিল্মের সমকক্ষ বা গুণগত মানের দিক থেকে সমপর্যায়ভুক্ত হওয়ার অভিপ্রায়ে

ডিজিটাল প্রযুক্তিকে আরও উন্নত এবং উৎকর্ষের দিক থেকে আরও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে তৈরি ক্যামেরাগুলোতে আসে অভাবনীয় অগ্রগতি। নিত্যনতুন গবেষণা এবং উন্নত প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে তথা ব্যবহারকারী বা ভোক্তা পর্যায়ে চাহিদার কথা বিবেচনা করে ইতিপূর্বেকার সমস্ত কারিগরি ত্রুটি ও অন্য প্রতিবন্ধকতাগুলোকে অপসারিত করে এই নতুন প্রযুক্তি এক বিস্ময়কর সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করে দিতে সক্ষম হয়। সত্যিকার অর্থে, এটি সমস্ত শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে একটি শুধু সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য প্রযুক্তি হিসেবে আবেদন সৃষ্টি বা আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়নি, এই একবিংশ শতাব্দীকে 'ডিজিটাল যুগ' (digital era) হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ডিজিটাল প্রযুক্তি উদ্ভাবনের শুরুতেই প্রথমে মোবাইল ফোন তথা বাক্যালাপ, সংগীত, স্থিরচিত্র এবং তারপর চলমান ছবি, সব মিলিয়ে প্রযুক্তির ক্রমাগত উন্নয়ন আমাদের দৈনন্দিন তথা পারিবারিক জীবনে এবং সামাজিক পরিমণ্ডলেও এক সৃজনশীল এবং ভিন্ন রুচিবোধের প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রযুক্তি কখনো থেমে থাকেনি, দ্রুতলয়ে প্রতিটি মুহূর্তে এগিয়ে যাচ্ছে এবং সেই সাথে সমস্ত কারিগরি দিকগুলোও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কখন যেন অজান্তে মিশে গেছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির কল্যাণে অডিও-ভিজ্যুয়াল তথা টেলিভিশন কিংবা চলচ্চিত্র মাধ্যমেও সমস্ত তাত্ত্বিক এবং ভাষিক পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে, যাতে জড়িয়ে আছে কয়েকটি সাংকেতিক চিহ্ন, যাকে আমরা 'সিগন্যাল' বলে থাকি।

তথ্যসূত্র

১) The Film Maker's Handbook – Steven Ascher & Edward Pincus .

২) The Basics of Camera Technology, Product Department-SONY Corporation.

৩) Lectures & Workshop notes-Alestar Chapman, BBC Cinematographer and Brand Ambassador of SONY 4K Digital Cine Camera.

লেখক পরিচিতি

পঙ্কজ পালিত : চিত্রগ্রাহক ও চলচ্চিত্র-শিক্ষক।

ডিজিটাল ভিডিওর কারিগরি দিক

মুহাম্মদ ফেরদৌস আলম সিদ্দিকী

ভিডিওর নাম শুনে পাঠকের চমকে ওঠার কিছু নেই। ১৯৪০-এর দশকের প্রথম দিক থেকে টেলিভিশনের বিকাশের কারণে ভিডিও ধীরে ধীরে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। শুধু সংবাদ বা বিনোদনমাধ্যম হিসেবেই নয়, বাসায় বসে সরাসরি খেলা দেখা, এমনকি যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত আজ আমরা দেখতে পাই লিভিংরুমে বসে। তবে ভিডিও এখন শুধু টেলিভিশনেই সীমাবদ্ধ নেই, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির প্রভূত উন্নয়নের ফলে বর্তমানে এর ব্যবহার সর্বব্যাপী। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক, ইউটিউব থেকে শুরু করে জনপ্রিয় অনলাইন স্ট্রিমিং বায়োস্কোপ লাইভ, আইফ্লিক্স বা নেটফ্লিক্স, কোথায় নেই ডিজিটাল ভিডিও। এ ছাড়া এটি এখন চলচ্চিত্র নির্মাণে সেলুলয়েড ফিল্মের পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিভিন্ন ফটোগ্রাফিক ক্যামেরা ডিএসএলআর, পয়েন্ট অ্যান্ড শুট, অ্যাকশন ক্যামেরাসহ সবার হাতে থাকা স্মার্টফোনটি পর্যন্ত আজ ব্যবহৃত হচ্ছে ভিডিও ধারণে। ফলে বিভিন্ন মানের ইমেজ পাওয়া যাচ্ছে। ডিজিটাল ভিডিওর কারিগরি

বিষয় সম্পর্কে জানা থাকলে মানসম্পন্ন চলচ্চিত্র বা ভিডিও প্রোডাকশন তৈরি করা সহজ হয়। এই অফুরন্ত সম্ভাবনাকে পাঠকসমাজে সংক্ষেপে তুলে ধরাই কারিগরি দিকনির্ভর বর্তমান লেখাটির প্রধান উদ্দেশ্য।

মূল আলোচনায় আসার প্রারম্ভে ভিডিও প্রসঙ্গে প্রাথমিক কিছু আলোচনা জরুরি মনে করা হয়েছে। ভিডিও হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যার সাহায্যে চলমান ইমেজকে ধারণ করা হয়। আসলে চলমান ইমেজ নয়, ভিডিও স্থিরচিত্রই ধারণ করে। আমাদের কাছে যা কিছু চলমান চিত্র বলে মনে হয়, তা আসলে বিভ্রম। এর কারণ Persistance of Vision বা অবিরাম দৃষ্টিতত্ত্ব। আমাদের চোখের সামনে থেকে কোনো ইমেজকে সরিয়ে নেওয়া হলেও এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ের জন্য এই ইমেজ মানুষের চোখের রেটিনায় বিদ্যমান থাকে। এই ইমেজ দৃষ্টিতে থাকতে থাকতেই পরবর্তী ফ্রেম নিয়ে আসলে মানুষের চোখ এই ইমেজের পরিবর্তনকে আলাদা করতে পারে না। ফলে ইমেজগুলোকে একই ইমেজ হিসেবে ভ্রম হয়। এভাবেই একটি কন্টিনিউয়াস বা গতিশীল ইমেজের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ বলা যায়, মানুষের সীমাবদ্ধতা থেকেই ভিডিওর সৃষ্টি।

শুরু থেকে এই মাধ্যমের ব্যবহার যেমন পরিবর্তিত হয়েছে, তেমনি তার প্রকৃতিও বিকশিত হয়েছে। ভিডিও সিগন্যাল প্রথমে অ্যানালগ হিসেবে শুরু হয়েছে। অ্যানালগ সিগন্যাল হলো নিরবচ্ছিন্ন বা কন্টিনিউয়াস।

ভিডিও ক্যামেরা এনালগ পদ্ধতিতে রেকর্ডিং

এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত মান সীমাবদ্ধ নয়, অসীমও হতে পারে। ভিডিওতে সেন্সরে আসা উজ্জ্বল আলো উচ্চতর ভোল্টেজ আর কম আলো নিম্নতর ভোল্টেজে রূপান্তরিত হয়। অ্যানালগ প্রযুক্তিতে তথ্য সংরক্ষণ বা আদান-প্রদানে মূল বিষয়ের সাদৃশ্য বা অনুরূপ ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সনাতন চলচ্চিত্র অ্যানালগ। এতে আলোক সংবেদনশীল মাধ্যমে হিসেবে ব্যবহার হলো সেলুলয়েড ফিল্ম। এটি হলো একটি প্লাস্টিক। এর ওপরে থাকে আলোক সংবেদনশীল সিলভারের প্রলেপ। একে বলা হয় ইমালশন। যখন ইমালশনের ওপর লেন্স দিয়ে আসা আলো এসে

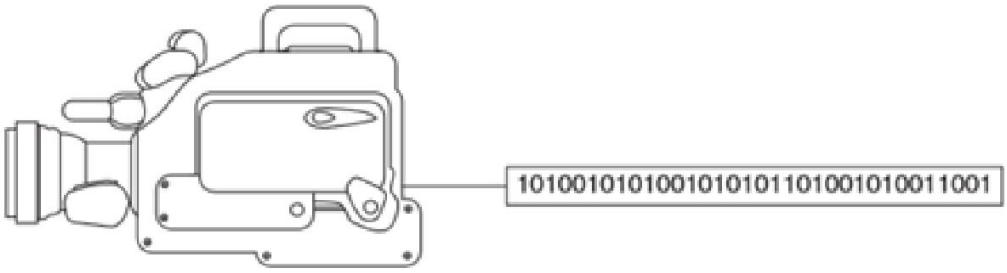

ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা বাইনারি পদ্ধতিতে রেকর্ডিং

পড়ে, তখন ইমালশন প্রতিক্রিয়া দেখায়। কিন্তু তখনো ইমেজটি দেখা যায় না। এটি সুপ্ত ইমেজ হিসেবে থাকে। পরবর্তী সময়ে একে যখন ল্যাবে ডেভেলপ ও প্রসেসিং করা হয়, তখন যে ইমেজটি আমরা দেখি তা হলো মূল ইমেজের অনুরূপ একটি ইমেজ। কিন্তু ডিজিটাল ভিডিও ভিন্ন। ডিজিটাল ভিডিও সিগন্যাল ডিসক্রিট বা বিচ্ছিন্ন। এতে প্রাপ্ত মান সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্ট। এতে ইমেজ বা অন্যান্য তথ্য সরাসরি সংরক্ষণ না করে প্রথমে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করা হয়। পরবর্তী সময়ে এই সংখ্যাগুলোই সংরক্ষণ করা হয়। ডিজিটাল ভিডিও প্রকৃতপক্ষে কিছু সংখ্যা বিধায় সহজে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা যায়। যেমন কালার কারেকশন, গ্রাফিকস, অ্যানিমেশন বা ইফেক্টের প্রয়োগ করে মূল ইমেজের ব্যাপক পরিবর্তন আনা যায়।

ঐতিহ্যগতভাবে টেপভিত্তিক ভিডিও সম্পাদনা হলো লিনিয়ার বা রৈখিক। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে শটসমূহকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ক্রমানুসারে নির্বাচন, সাজানো এবং সংশোধন করা হয়। ডিজিটাল ভিডিও যে পদ্ধতিতে সম্পাদনা করা হয় তা হলো নন-লিনিয়ার বা অরৈখিক। এই পদ্ধতিতে শটসমূহ ক্রমানুসারে সম্পাদনা করতে হয় না। যেকোনো সময়ে স্ক্রিপ্টের যেকোনো দৃশ্য সম্পাদকের মর্জিমাফিক পরিবর্তন করা যায়। সম্পাদনা পছন্দ না হলে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় সহজেই। ফলে বিকল্প চেষ্টা করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায়।

বর্তমানে ইন্টারনেট সহজলভ্য। সবাই এখন একে অপরের সাথে সংযুক্ত। তথ্যের আদান-প্রদান হয় নিমেষেই। ডিজিটাল ভিডিও সহজে শেয়ার করা যায়। এর সুবিধা হলো কপি বা শেয়ার করলে তথ্যের কোনো পরিবর্তন হয় না। সেলুলয়েড ফিল্ম বা টেপভিত্তিক ভিডিওর ক্ষেত্রে এমনটি দেখা যায় না।

ডিজিটাল ভিডিওর গুণগত মান দিন দিন উন্নত হচ্ছে। দৃশ্যধারণে যে ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা ব্যবহার হয়, তা আকারে তুলনামূলকভাবে ছোট ও কম দামি। রেজল্যুশন, ফ্রেমরেইট, স্ক্যানিং, ডাইনামিক রেঞ্জ, বিট ডেপথ, বিট রেইট, কম্প্রেশন, ফাইল ফরম্যাট, সেন্সরসহ নানাবিধ বিষয়ের ওপর ডিজিটাল ভিডিওর ইমেজের গুণগত মান নির্ভরশীল।

রেজল্যুশন (Resolution)

সেকেন্ডে ২৪,২৫ বা ৩০টি ফ্রেম বা ইমেজ নিয়ে ডিজিটাল ভিডিও গঠিত। প্রতিটি ইমেজ আবার অসংখ্য লাইন নিয়ে তৈরি। আর প্রতিটি লাইনে থাকে অসংখ্য পিক্সেল। পিক্সেল (Pixel) হলো ইমেজের ক্ষুদ্রতম উপাদান। প্রতিটি ইমেজে ঠিক কতকগুলো পিক্সেল থাকে, তা আমরা জানতে পারি রেজল্যুশন দিয়ে। ধরা যাক, একটি ডিজিটাল ভিডিও ইমেজের রেজল্যুশন ১৯২০×১০৮০। এর অর্থ অনুভূমিকভাবে ১৯২০টি এবং উলম্বভাবে ১০৮০টি পিক্সেল রয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, ১৯২০টি পিক্সেলের কলাম এবং ১০৮০টি পিক্সেলের সারি রয়েছে। সুতরাং সর্বমোট পিক্সেল সংখ্যা ১৯২০ × ১০৮০ = ২০,৭৩,৬০০টি বা ২.৭ মেগাপিক্সেল (১০ লাখ পিক্সেল = ১ মেগা পিক্সেল)। একটি ইমেজের রেজল্যুশন বেশি হলে ইমেজের কোয়ালিটি যেমন শার্পনেস এবং ডিটেইল বেশি হবে। পিক্সেলের সংখ্যা বেশি হলে প্রতিটি পিক্সেল ক্ষুদ্রাকৃতির হবে, ফলে বড় স্ক্রিন হলেও পিক্সেল চোখে পড়বে না। রেজল্যুশন বেশি হলে অসুবিধা একটি। দৃশ্যধারণ করতে বেশি স্পেস লাগবে, ফলে স্টোরেজ ডিভাইস ব্যবহার করতে হবে বেশি। ধরা যাক, দুটি ভিডিও ইমেজের রেজল্যুশন ১৯২০ × ১০৮০ এবং ৭২০ × ৫৭৬। এ ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত ইমেজের পিক্সেলসংখ্যা দ্বিতীয় ইমেজের চেয়ে বেশি। ফলে প্রথমোক্ত ইমেজের কোয়ালিটি বেশি হবে, তবে এর জন্য স্পেস বেশি প্রয়োজন হবে।

চিত্র: রেজল্যুশন বেশি হলে ইমেজের গুণগত মান উন্নত হয়

রেজল্যুশনের দিক দিয়ে ডিজিটাল ভিডিওকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন স্ট্যান্ডার্ড ডেফিনেশন, হাইডেফিনেশন এবং আল্ট্রা হাইডেফিনেশন ভিডিও। স্ট্যান্ডার্ড ডেফিনেশন ভিডিওর রেজল্যুশন কম। এই ধরনের ফরম্যাটে সবচেয়ে কমসংখ্যক পিক্সেল বা রেজল্যুশন লাইন থাকে। যেমন ৭২০ × ৫৭৬। বড় স্ক্রিনে স্ট্যান্ডার্ড ডেফিনেশন ইমেজকে আনশার্প ও কম ডিটেইল সম্পন্ন মনে হয়। এ ছাড়া পিক্সেলসমূহ দৃশ্যমান হবে।

SD / Standard Defination	720 × 576
HD / High Defination	1280 × 720
Full HD	1920 × 1080
QHD or Quad HD	2560 × 1440
Ultra HD 4K	3840 × 2160
4K Digital Cinema	4096 × 2160
Ultra HD 8K	7680 × 4320

হাইডেফিনেশন ভিডিওর ক্ষেত্রে প্রতি ফ্রেমে বেশিসংখ্যক পিক্সেল বা রেজল্যুশন লাইন থাকবে। বড় স্ক্রিনে হাইডেফিনেশন ইমেজকে অনেক বেশি শার্প, স্বচ্ছ ও বেশি ডিটেইল সম্পন্ন মনে হয়। পিক্সেল এত ছোট হয় যে চোখে পড়ে না। বর্তমানে অনেক ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা আছে, যার সাহায্যে ৪ক বা এর চেয়ে বেশি রেজল্যুশনের ইমেজ ধারণ করা যায়। এখন স্মার্টফোন পর্যন্ত HD/4K ভিডিও রেকর্ডিংয়ের সুবিধা দিচ্ছে। ৪ক টেলিভিশনও এখন অনেকটা সহজলভ্য।

আসপেক্ট রেশিও (Aspect Ratio)

এটি হলো ইমেজের দৈর্ঘ্য ও উচ্চতার অনুপাত, যা দিয়ে বোঝা যায় ভিডিও ইমেজ বা ফ্রেমের আকার। স্ট্যান্ডার্ড ডেফিনেশন ভিডিওর ইমেজে ব্যবহৃত আসপেক্ট রেশিও ৪:৩। ইমেজের দৈর্ঘ্য যদি ৪ ইঞ্চি হয় তবে উচ্চতা ৩ ইঞ্চি। আর হাইডেফিনেশনের ক্ষেত্রে আসপেক্ট রেশিও ১৬:৯। ইমেজের দৈর্ঘ্য যদি ১৬ ইঞ্চি হয়, তবে উচ্চতা হবে ৯ ইঞ্চি।

স্ক্যানিং পদ্ধতি (Scanning System)

ভিডিওতে ইমেজ গঠনের মৌলিক নীতি স্ক্যানিং প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল, যা সাদাকালো টেলিভিশন, রঙিন টেলিভিশন, স্ট্যান্ডার্ড অ্যানালগ টেলিভিশন এবং ডিজিটাল হাইডেফিনেশন টেলিভিশনের জন্য একইভাবে প্রযোজ্য। কোনো ইমেজ দেখার সময় মানুষের চোখ সম্পূর্ণ ইমেজটি একবারেই দেখে। কিন্তু টেলিভিশনে

যখন ভিডিও ইমেজ দেখা হয়, তখন ইমেজের সম্পূর্ণ অংশ একবারে দেখা হয় না, বরং এটি ক্ষুদ্রতম উপাদানে, অর্থাৎ অসংখ্য লাইনে বিভক্ত হয়ে যায়। এই লাইনগুলোকে বলা হয় স্ক্যানিং লাইন। প্রতিটি ইমেজ প্রদর্শন হবার সময়ে দুই ধরনের স্ক্যানিং পদ্ধতি অনুসরণ করে। ইন্টারলেইসড পদ্ধতি (Interlaced Scanning) আরেকটি হলো প্রগ্রেসিভ স্ক্যানিং পদ্ধতি (Progressive Scanning)।

ইন্টারলেইসড পদ্ধতিতে প্রতিটি ফ্রেম দুই ভাগে বিভক্ত হয়। প্রতিটি ভাগকে বলা হয় ফিল্ড। অড ফিল্ড বা বিজোড় ফিল্ডে ইমেজের অর্ধেক থাকে আর বাকি অর্ধেক থাকে ইভেন ফিল্ডে। প্রথমে বিজোড় লাইনকে ওপর থেকে নিচে স্ক্যান করা হয়। অর্থাৎ বাম দিক থেকে ১ম লাইন থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে ৩,৫,৭,৯,১১....শেষ বিজোড় লাইন পর্যন্ত যাবে। তারপর ইভেন ফিল্ড বা জোড় ফিল্ডে জোড় লাইনকে স্ক্যান করা হয়। অর্থাৎ ২,৪,৬,৮,১০...হয়ে আবার শেষ জোড় লাইনে যাবে। স্ট্যান্ডার্ড ডেফিনেশন টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং সিস্টেম এই পদ্ধতিতে কাজ করে থাকে। ইন্টারলেইসড স্ক্যানিংকে সংক্ষেপে 'i' দ্বারা বোঝানো হয়। আমরা জানি, PAL টেলিভিশন সম্প্রচার পদ্ধতিতে প্রতি সেকেন্ডে ফ্রেম প্রদর্শিত হয় ২৫টি। প্রতিটি ফ্রেম যেহেতু দুইবারে বা দুটি ফিল্ডে ভাগ হয়, সেহেতু বলা যায়, সেকেন্ডে ৫০ ফিল্ড প্রদর্শিত হয়। এ জন্য লেখা হয় ৭২০×৫৭৬ (50i) বা ৫৭৬ (50i), NTSC পদ্ধতিতে প্রতি সেকেন্ডে ৩০ ফ্রেমকে লেখা হয় ৭২০×৪৮০ (60i) বা ৪৮০ (60i)।

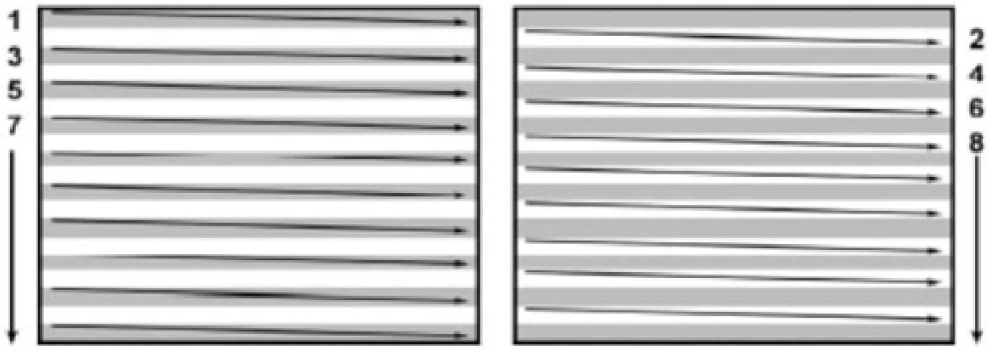

ইন্টারলেসড স্ক্যানিং পদ্ধতি, অড ফিল্ড ও ইভেন ফিল্ড

প্রগ্রেসিভ স্ক্যানিং

প্রিন্টার যে পদ্ধতিতে প্রিন্ট করে, ওপর থেকে নিচে অথবা আমরা যে পদ্ধতিতে একটি পৃষ্ঠা পড়ি বা লিখি, সেই পদ্ধতি এখানে অনুসরণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি ফ্রেম দুই ভাগে বিভক্ত হয় না। স্ক্যানিং বাম দিকে ১ম লাইন থেকে শুরু হয়ে ক্রমান্বয়ে সর্বশেষ লাইন পর্যন্ত গিয়ে শেষ হবে। অর্থাৎ ১ম লাইন থেকে শুরু হয়ে

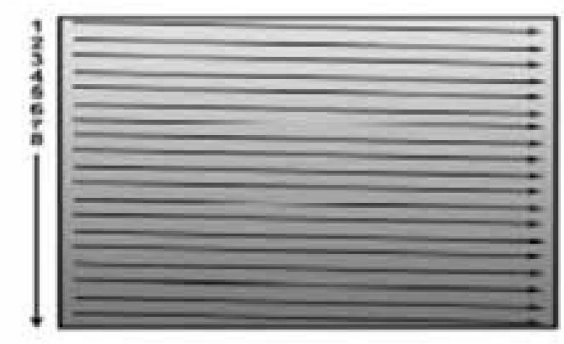

প্রগ্রেসিভ স্ক্যানিং পদ্ধতি

ক্রমান্বয়ে ২,৩,৪,৫,৬...শেষ লাইন পর্যন্ত যাবে। প্রগ্রেসিভ স্ক্যানিংকে সংক্ষেপে 'i' দ্বারা বোঝানো হয়। যেমন 576p / 576 (25p), 1080p / 1080 (30p).

দুটি স্ক্যানিং সিস্টেমের মধ্যে বর্তমানে প্রগ্রেসিভ স্ক্যানিংয়ের ব্যবহার সর্বাধিক এবং সুবিধাজনক। এতে প্রাপ্ত ভিডিও ইমেজ তুলনামূলকভাবে বেশি স্মুথ ও শার্প হয়। স্পেশাল ইফেক্ট বা গ্রাফিকসের কাজ থাকলে এই পদ্ধতিতে রেকর্ড করা ভালো। গতিশীল বিষয়বস্তুর দৃশ্য ধারণে এই পদ্ধতিতে ইমেজ শার্প পাওয়া যায় ইন্টারলেসইড পদ্ধতির চেয়ে। কিন্তু ব্রডকাস্টিং সিস্টেম, যেমন NTSC, PAL, SECAM ইন্টারলেইসড স্ক্যানিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে। যেহেতু একবারে সম্পূর্ণ ইমেজ স্ক্যান করতে হয় না, তাই এতে ডেটা ব্যান্ডউইথ এবং ফাইল সাইজ অর্ধেকে নেমে আসে।

হাইডেফিনেশন টেলিভিশন ইন্টারলেইসড/প্রগ্রেসিভ স্ক্যানিং পদ্ধতিতে কাজ করে। যদিও Ultra HD শুধু প্রগ্রেসিভ স্ক্যানিং পদ্ধতিতে কাজ করে। ওয়েবের জন্য, যেমন ইউটিউবের জন্য কোনো ভিডিও প্রজেক্ট করা হলে প্রগ্রেসিভ পদ্ধতিতে রেকর্ড করা উচিত। কারণ, বর্তমানে ডিজিটাল ভিডিও প্রদর্শন করার যন্ত্র এই পদ্ধতিতে কাজ করে। যেমন কম্পিউটার মনিটর। বেশির ভাগ হাইডেফিনেশন টেলিভিশন এখনো ইন্টারলেইসড পদ্ধতিতে কাজ করলেও প্রগ্রেসিভ বা নন-ইন্টারলেইসড পদ্ধতি সাপোর্ট করে। এ কারণে বেশির ভাগ ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা এখন দুই পদ্ধতিতেই ভিডিও রেকর্ড করতে পারে।

ফ্রেমরেইট

ডিজিটাল ভিডিও অনেকগুলো ফ্রেমের সমন্বয়ে গঠিত। সেকেন্ডে যে কয়টি ফ্রেম ক্রমাগত একটার পর একটা দেখানো হয়, তা-ই ফ্রেম রেট। একে FPS দিয়ে লেখা হয়। ভিডিওতে বহুল ব্যবহৃত ফ্রেমরেট হলো ২৪, ২৫ অথবা ২৯.৯৭ ফ্রেম পার সেকেন্ড। এর মধ্যে চলচ্চিত্র ২৪ ফ্রেম, NTSC সম্প্রচার পদ্ধতিতে ২৯.৯৭ ফ্রেম এবং PAL/SECAM সম্প্রচার পদ্ধতিতে ২৫ ফ্রেম পার সেকেন্ডে ইমেজ প্রদর্শন হয়। যদিও প্রতি সেকেন্ডে এর চেয়ে বেশি বা কম ফ্রেম ক্যামেরায় ধারণ করা যায়। তারপর প্রতি সেকেন্ডে নির্ধারিত ২৪/২৫/২৯.৯৭ ফ্রেমরেটে প্রদর্শন করা হলে স্লো মোশন বা ফাস্ট মোশন ইফেক্ট তৈরি হয়। Over Cranking হলো বেশি ফ্রেমরেটে

(যেমন 240 fps) দৃশ্য ধারণ করে সেকেন্ডে 25/24 fps-এ প্লেব্যাক করার প্রক্রিয়া। এতে স্লো মোশন ইফেক্ট তৈরি হবে। সাধারণত খুব বেশি গতিসম্পন্ন বস্তুর মুভমেন্ট ধারণ করার জন্য হাইস্পিড ক্যামেরা ব্যবহৃত হয়। যেমন Phantom V2512। এই ক্যামেরার সাহায্যে প্রতি সেকেন্ডে লক্ষাধিক ফ্রেম রেকর্ড করা যায়। Under Cranking হলো সেকেন্ডে 25/24 fps-এর চেয়ে কম ফ্রেমরেটে (যেমন 18fps) দৃশ্য ধারণ করে সেকেন্ডে 25/24 fps-এ প্লেব্যাক করার প্রক্রিয়া।

হাই স্পীড ক্যামেরা Phantom V2512

এতে ফাস্ট মোশন ইফেক্ট তৈরি হয়। এ ছাড়া বর্তমানে স্মার্টফোনসহ বিভিন্ন ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরায় টাইমলেপস ভিডিও (Timelapse Video) ধারণ করা যায় সহজেই। এই প্রক্রিয়ায় ক্যামেরা অনেক সময়ের জন্য চালু থাকলেও প্রতি সেকেন্ডে বা মিনিটে অল্পসংখ্যক ফ্রেম ধারণ করা হয়। তারপর নির্ধারিত ফ্রেমরেটে প্লেব্যাক করা হলে সুপার ফাস্ট মোশন ইফেক্ট তৈরি হয়।

হাইডাইনামিক রেঞ্জ (HDR)

ডাইনামিক রেঞ্জ হলো আলোর অন্ধকার থেকে উজ্জ্বলতার এমন এক সীমা, যার মধ্যে থাকলে ক্যামেরা সাবজেক্টের ডিটেইল তুলে ধরতে পারে। অর্থাৎ এই সীমার

HDR প্রয়োগ করে ডাইনামিক রেঞ্জ বর্ধিতকরণ

বাইরে গেলে ছায়ায় এবং হাইলাইটের মধ্যে ডিটেইল পাওয়া যাবে না। যত বেশি ডাইনামিক রেঞ্জ হবে, তত বেশি ছায়া এবং হাইলাইটের মধ্যে ডিটেইল দেখা যাবে। ভিডিও ক্যামেরার ডাইনামিক রেঞ্জ তুলনামূলকভাবে কম। ডাইনামিক রেঞ্জ বেশি পাওয়ার জন্য ডিজিটাল সিনেমা ক্যামেরায় 'র' এবং 'লগ' পদ্ধতিতে রেকর্ড করা হয়। সংক্ষেপ করার তাগিদে বর্তমান লেখায় এই বিষয়ে আলোকপাত করা হচ্ছে না। সম্প্রতি বেশ কিছু ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরায় HDR নামক একটি সুবিধা সংযুক্ত হয়েছে। এর কাজ হলো ডাইনামিক রেঞ্জকে বর্ধিত করা। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি ফ্রেমের বিপরীতে অতিরিক্ত একটি বা দুটি ফ্রেম ধারণ করা হয়। একটি ফ্রেমের এক্সপোজার পারফেক্ট থাকে, অন্য ফ্রেম আন্ডার এক্সপোজ ধারণ করা হয়। ফলে হাইলাইটের ডিটেইল পাওয়া যায়, অন্য আরেকটি ফ্রেম ওভার এক্সপোজ নেওয়া হয়, ফলে ছায়ায় থাকা অংশে ডিটেইল থাকে। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি ফ্রেমের বিপরীতে যে কয়েকটি ফ্রেম পাওয়া যায়, তা একসাথে ব্লেন্ড করা হয় ক্যামেরায় অথবা কম্পিউটারে নির্দিষ্ট সফটওয়্যারে। ফলে এমন একটি দৃশ্য পাওয়া যায়, যেখানে একই সাথে হাইলাইট ও শ্যাডো এলাকায় ডিটেইল পাওয়া যায়। সাধারণত কন্ট্রাস্টি দৃশ্য বা আলো-আঁধারির বৈপরীত্য আছে, এমন দৃশ্যে ভালো ফল পাওয়া যায়। যদিও এই ধরনের ভিডিওতে অনেক বেশি স্টোরেজ বা স্পেস প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ডাইনামিক রেঞ্জ বর্ধিত করার জন্য রেড সিনেমা ক্যামেরায় HDRx নামে একটি ফিচার আছে। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি ফ্রেমের সাথে অতিরিক্ত আরেকটি ফ্রেম ধারণ করা হয়, যেখানে কয়েক স্টপ আন্ডার এক্সপোজার থাকে। ফলে পোস্ট-প্রোডাকশনে নির্ধারিত সফটওয়্যারের মাধ্যমে যখন ফ্রেম দুটিকে ব্লেন্ড করা হয়, তখন কয়েক স্টপ বেশি ডাইনামিক রেঞ্জ পাওয়া যায়।

বিট ডেপথ বা কালার ডেপথ (Bit Depth)

ডিজিটাল ইমেজে প্রতিটি পিক্সেলের আলো ও রঙের পরিমাণ প্রকাশের জন্য যে কয়টি বিট ব্যবহার করা হয়, তাই বিট ডেপথ। একে কালার ডেপথও বলা হয়। যত বেশি বিট ডেপথ, তত বেশি আলো ও রঙের সূক্ষ্ম পার্থক্য ধারণ করা যাবে এবং বেশি রং প্রকাশ করা যাবে। যদিও এতে ডিজিটাল তথ্য বেশি বিধায় স্টোরেজ বেশি লাগবে। যেমন একটি ইমেজের জ, এ এবং ই-এর প্রত্যেকটি চ্যানেল যদি ৮

Bit Depth	Tones Per Pixel	Total Possible Tone
8 bit	256	16.78 million
10 bit	1,024	1.07 billion
12 bit	4,095	68.68 billion
14 bit	16,383	4.39 trillion
16 bit	65,532	281 trillion

বিটডেপথ ও কালার টোন এর সম্পর্ক

বিটবিশিষ্ট হয়, তবে প্রতি পিক্সেলের জন্য ৮ × ৩ = ২৪ বিট ধরা হবে। ফলে লালের (২৮ = ২৫৬) জন্য ২৫৬, সবুজের জন্য ২৫৬ এবং নীলের জন্য ২৫৬ ধরনের টোন পাওয়া যাবে। অর্থাৎ একটি ৮ বিটের ইমেজের প্রতিটি পিক্সেলে প্রায় ১৬ মিলিয়ন (২৫৬×২৫৬×২৫৬=১৬.৭৮ মিলিয়ন) রকম টোন পাওয়া যায়। জ,এ এবং ই-এর প্রত্যেকটি চ্যানেল যদি ১২ বিট হয়, তবে তিন চ্যানেল মিলে ৩৬ বিট ধরা হবে। প্রতিটি পিক্সেলে সর্বমোট ৬৮ বিলিয়ন কালার টোন পাওয়া যাবে। অর্থাৎ বিট রেট বাড়লে কালার ডেপথ বাড়বে।

বিট রেইট (Bit Rate)

এর মাধ্যমে জানা যায় ১ সেকেন্ডের ইমেজকে উপস্থাপন করতে কত ডেটার প্রয়োজন। প্রতি সেকেন্ডে বাইট হিসেবে পরিমাপ করা হয়। একে ডেটা রেইটও বলা হয়ে থাকে। ভিডিও সিগনালের বিট রেট যত বেশি হবে, ইমেজ কোয়ালিটি তত ভালো হবে। কিন্তু স্টোরেজ বেশি লাগবে। ১৯২০ × ১০৮০ রেজল্যুশনের প্রতিটি ফ্রেমের জন্য ডেটা প্রয়োজন হয় ৫.৯৩ মেগাবাইট। অর্থাৎ বিট রেইট -১৫২ মেগাবাইট/সেকেন্ড।

কম্প্রেশন (Compression)

ক্যাবল বা তার-বিহীন যা-ই হোক না কেন, ডিজিটাল ভিডিও সিগন্যালের জন্য ব্যান্ডউইথ প্রচুর প্রয়োজন হয়, যেহেতু এটি ব্যাপক পরিমাণ তথ্য ধারণ করে। ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা যে পরিমাণ তথ্য উৎপাদন করে, তার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক স্টোরেজ বা হার্ডডিস্ক স্পেস। ১৯২০ × ১০৮০ রেজুলেশনের প্রতি ঘণ্টার ইমেজের জন্য প্রয়োজন হয় প্রায় ৫০০ গিগাবাইট স্পেস। এই বিশাল তথ্য ক্যামেরায় প্রসেস করে স্টোর করা এবং পরবর্তী সময়ে পোস্ট-প্রসেসিং করা বিশাল ঝামেলাপূর্ণ ব্যাপার। এ জন্য প্রয়োজন হয় তথ্যের কম্প্রেশন। এর ফলে ডিজিটাল ডেটা প্রবাহের জন্য তুলনামূলকভাবে কম ব্যান্ডউইথ প্রয়োজন হয় এবং স্টোরেজও কম লাগে।

কম্প্রেশন দুই রকমের। লসলেস (lossless Compression) এবং লসি কম্প্রেশন (lossy Compression)। লসলেস কম্প্রেশন পদ্ধতিতে কম্প্রেশ করা ভিডিও ইমেজটিকে যখন পুনরায় ডি-কম্প্রেশ করা হয়, তখন মূল ইমেজের হুবহু সাদৃশ্য ইমেজ পাওয়া যায়। এতে ইমেজের কোনো তথ্যের অপচয় বা পরিবর্তন হয় না। অন্যদিকে লসি কম্প্রেশন পদ্ধতিতে প্রদর্শন হওয়া ইমেজটি মূল ইমেজের হুবহু ইমেজ নয়। কিছুটা ডিটেইল কম থাকে, যেহেতু তথ্যের পরিমাণ কম থাকে। কিন্তু

ফাইলের আকার কম হয়। লসি কম্প্রেশন পদ্ধতিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ইন্ট্রাফ্রেম ও ইন্টারফ্রেম কম্প্রেশন।

ইন্ট্রাফ্রেম কম্প্রেশন (Intraframe Compression /Spatial Compression)

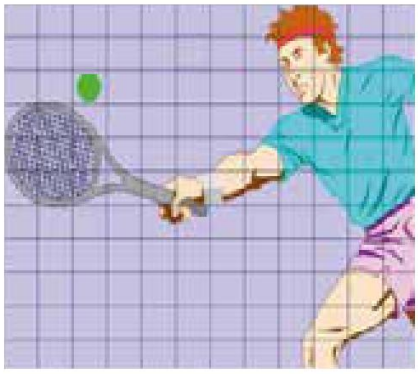

ইমেজের রঙ এর পুনরাবৃত্তি

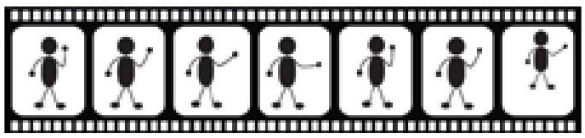

ইন্ট্রাফ্রেম কম্প্রেশন

প্রতিটি ভিডিও ইমেজ বা ফ্রেমে প্রচুর পরিমাণ তথ্যের পুনরাবৃত্তি থাকে। যেমন আকাশ, একই রঙের দেয়াল, পোশাক ইত্যাদি। এই সংক্ষেপণ পদ্ধতিতে প্রতিটি ফ্রেমের মধ্যে একই রকম তথ্য যা আছে, তা বাদ দিয়ে শুধু প্রয়োজনীয় তথ্য রেখে তথ্যের পরিমাণ কমানো হয়। প্রতিটি ফ্রেমকে ৪ পিক্সেল × ৪ পিক্সেলের গ্রুপ বা ৮ পিক্সেল × ৮ পিক্সেলের গ্রুপে বিভক্ত করে কম্প্রেশন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি ফ্রেমে পিক্সেলের গ্রুপ ৮ পিক্সেল × ৮পিক্সেল। ধরা যাক, ৬৪টি পিক্সেলের এই ব্লকে একটি পিক্সেলের সাথে অন্য ৬৩টি পিক্সেলের তথ্যে মিল আছে। তবে বাকি পিক্সেলের তথ্য সংরক্ষণ না করে শুধু একটি নির্দেশনামূলক কোড সংরক্ষণ করা হয়। স্থিরচিত্র এবং মানসম্পন্ন ডিজিটাল ভিডিওতে এই পদ্ধতির প্রয়োগ হয়। উদাহরণ JPEG, JPEG ২০০০ কম্প্রেশন।

ইন্টারফ্রেম কম্প্রেশন (Interframe Compression /Temporal Compression)

উপরোক্ত কম্প্রেশন পদ্ধতি একটি স্বতন্ত্র ফ্রেমের মধ্যে থাকা অপ্রয়োজনীয় তথ্য বাদ দেয়। কিন্তু দেখা যায়, ভিডিওতে একটি ফ্রেমের সাথে পাশের ফ্রেমসমূহের পার্থক্য খুবই নগণ্য। ফলে তথ্যের প্রচুর পুনরাবৃত্তি থাকে। এ সকল ক্ষেত্রে যে সংকোচন প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয় তা হলো ইন্টারফ্রেম কম্প্রেশন। এই পদ্ধতিতে পার্শ্ববর্তী

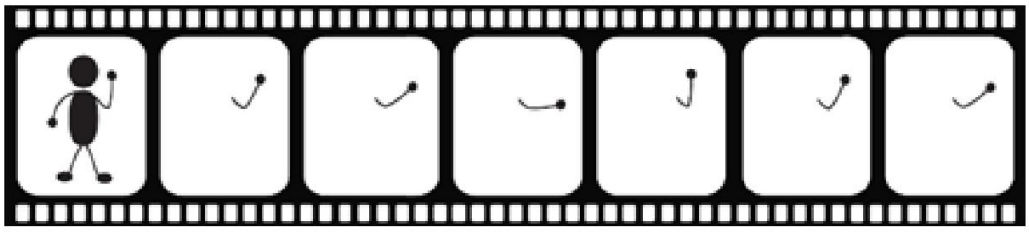

IPB কম্প্রেশন

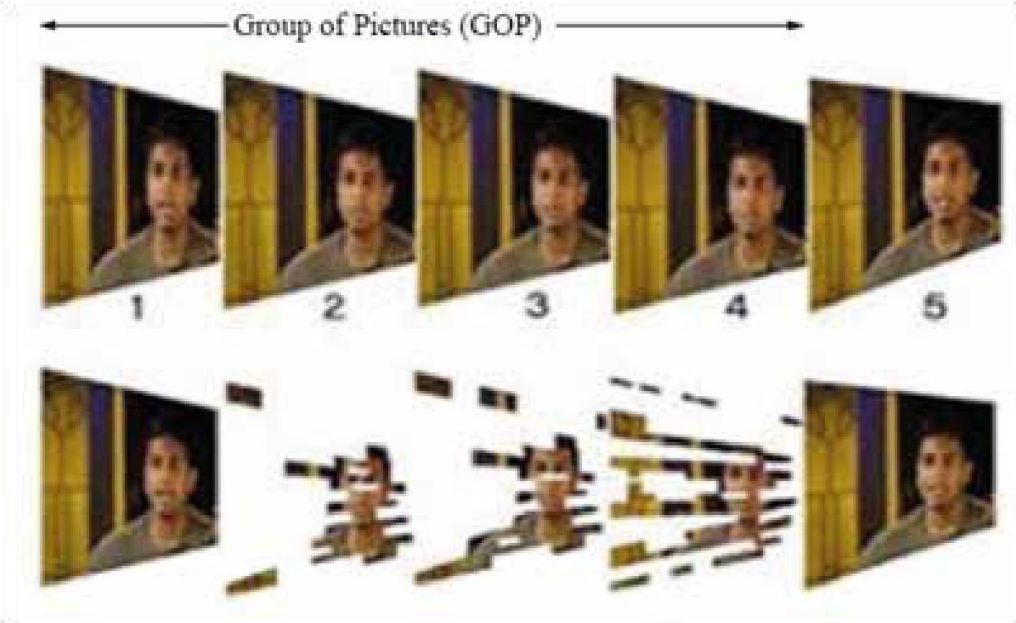

ফ্রেমসমূহের মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অপ্রয়োজনীয় অংশকে বাদ দেওয়া হয়। কম্প্রেশন একটি রেশিও দ্বারা বর্ণিত হয়। যেমন, কম্প্রেশন রেশিও ৪:১ বা ৮:১। কম্প্রেশন রেশিও বেশি হলে ইমেজের মান কমে যাবার সম্ভাবনা থাকে, যদিও ফাইলের আকার কমে। উদাহরণ MPEG Compression। এই সংকোচন পদ্ধতিতে ইন্ট্রাফ্রেম বা ইন্টারফ্রেম কম্প্রেশন পদ্ধতির প্রয়োগ হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে তিন ধরনের ফ্রেম থাকে। I,P এবং B ফ্রেম। একটি I ফ্রেম এবং কয়েকটি P এবং B ফ্রেম নিয়ে একটি Group of Pictures (GOP) গঠিত। প্রতিটি গ্রুপ ও ফ্রেম দিয়ে শুরু হবে এবং অনেকগুলো একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত B এবং P ফ্রেম থাকে। প্রতিটি GOP-এ ফ্রেমসংখ্যা সুনির্দিষ্ট নয়। কম্প্রেশনভেদে বিভিন্ন হতে পারে। যেমন ৮টি, ১৬টি বা আরও বেশিসংখ্যক ফ্রেম নিয়ে একেকটি GOP গঠিত হতে পারে। যেমন IBBBBPBBBBPBBBBI। GOP ছোট হলে, ও ফ্রেম বেশি হবে। ফলে সম্পাদনা করতে সুবিধা হয়। যদিও এতে ফাইলের আকার বাড়বে। কোনো কারণে যদি কোনো গ্রুপের I ফ্রেম নষ্ট হয়ে যায়, তবে সেই গ্রুপের আর কোনো ফ্রেম ঠিকঠাক থাকবে না। I ফ্রেম অন্য ফ্রেমের ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং এটি পরবর্তী ফ্রেমগুলোর জন্য রেফারেন্স হিসেবে কাজ করে। এই ফ্রেমে ইন্ট্রাফ্রেম কম্প্রেশন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। P ফ্রেম/Predicted ফ্রেম আগের ও ফ্রেমকে রেফারেন্স হিসেবে গ্রহণ করে পরিবর্তনটুকু শুধু রাখে। অর্থাৎ ও ফ্রেমের তুলনায় এই ফ্রেম কম ডেটা ধারণ করে। B ফ্রেম/Bidirectional ফ্রেমে আগের ও পরের I এবং P ফ্রেমকে রেফারেন্স হিসেবে গ্রহণ করে শুধু নতুন তথ্য থাকে। I এবং P ফ্রেমের তুলনায় এই ফ্রেম কম ডেটা ধারণ করে। সনি,

প্যানাসনিক, ক্যাননসহ বিভিন্ন ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা এই ইন্ট্রাফ্রেম ও ইন্টারফ্রেম এই দুই পদ্ধতিতেই কাজ করে। বেশ কিছু ক্যামেরায় সব ফ্রেম I ফ্রেম বা ইন্ট্রাফ্রেম কম্প্রেশন পদ্ধতির প্রয়োগের একটি অপশন থাকে। যদিও এতে ফাইলের আকার অনেক বেশি হয়।

ক্রোমা সাবসেম্পলিং (Color Subsampling)

ভিডিও সিগন্যালে দুই ধরনের তথ্য থাকে। লুমিনেন্স বা উজ্জ্বলতা এবং ক্রোমিনেন্স বা কালার। পিক্সেলের উজ্জ্বলতার তথ্যকে রং থেকে আলাদা করা হয়। ফলে একটি সাদা ও কালো ইমেজ পাওয়া যায়। বাকি দুটি চ্যানেল পিক্সেলের রঙের তথ্য জানান দেয়। দুটি চ্যানেলের একটিতে লাল রঙের তথ্য (উজ্জ্বলতা বাদ দিয়ে) অন্যটিতে নীল রং (উজ্জ্বলতা বাদ দিয়ে) থাকে। এতে আলাদাভাবে সবুজ রঙের তথ্য রাখা হয় না। পরবর্তী সময়ে লাল, নীল ও উজ্জ্বলতা থেকেই সবুজ রঙের মান বের করা হয়। এভাবে তথ্যের পরিমাণ সিগন্যাল থেকে কমানো হয়। আমরা জানি, মানুষের চোখ যতটা ব্রাইটনেস বা উজ্জ্বলতায় সংবেদনশীল, ততটা রঙে নয়। কোনো বস্তুর উজ্জ্বলতা কম বা বেশি হলে মানুষের চোখে ধরা পড়ে সহজেই। কিন্তু রঙের তথ্য যদি কম থাকে, তেমন একটা ধরতে পারে না। এই সুবিধাটুকু কাজে লাগিয়ে সামগ্রিকভাবে ফাইলের আকার এবং বিটরেট কমাতে ক্রোমা সাবসেম্পলিং নামক একটি কম্প্রেশন পদ্ধতির প্রয়োগ হয়। রঙের তথ্যের সবটা রেকর্ড না করে এর একটা অংশকে গ্রহণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি পিক্সেলের উজ্জ্বলতার তথ্য ঠিক রেখে রঙের তথ্য পার্শ্ববর্তী কতকগুলো পিক্সেলের মাঝে বণ্টন করা হয়। বর্তমানে ভিডিও ক্যামেরাতে প্রচলিত ক্রোমা সাবসেম্পলিং রেটগুলো হলো:

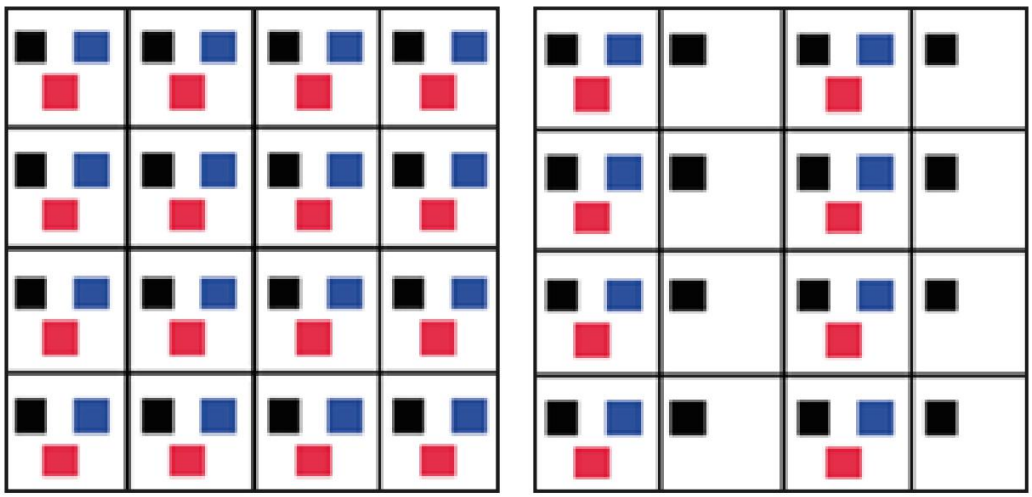

৪:৪ ২:২

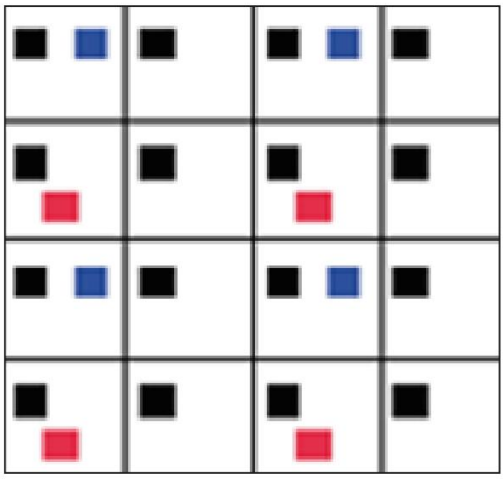

২:০

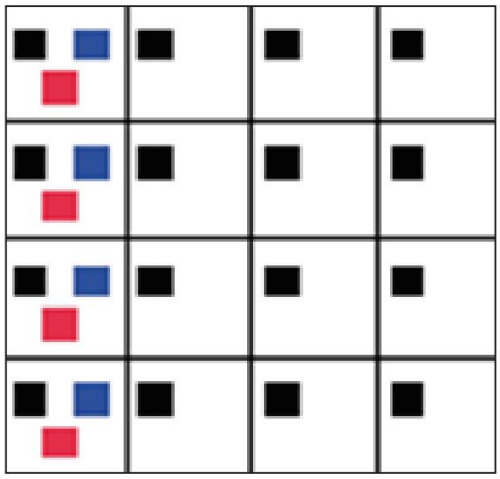

১:১

৪:৪:৪ এই পদ্ধতিতে কোনো কালার বা উজ্জ্বলতার ইনফরমেশনে কোনো কম্প্রেশন হয় না। প্রতিটি পিক্সেল তার আলাদা আলাদা উজ্জ্বলতা ও রঙের তথ্য সংরক্ষণ করে। অর্থাৎ এটির মাধ্যমে আনকম্প্রেশড RGB সিগন্যাল পাওয়া যায়, যা ব্যয়বহুল ডিজিটাল সিনেমা ক্যামেরাতে পাওয়া যায়। স্পেশাল ইফেক্ট, অ্যানিমেশন বা ক্রোমা কি-জাতীয় কাজ থাকলে এই পদ্ধতিতে ভালো ফল পাওয়া যায়। যদিও ভিডিও ফাইলের আকার অনেক বেশি হবে। প্রফেশনাল ডিজিটাল সিনেমা ক্যামেরা ছাড়া অন্য ভিডিও ক্যামেরায় এই পদ্ধতির খুব একটা প্রয়োগ দেখা যায় না। তবে মোটামুটি মানসম্পন্ন ভিডিও ক্যামেরায় এই পদ্ধতিতে রেকর্ডিং করার অপশন না থাকলেও দেখা যায় ৪:৪:৪ ভিডিও সিগন্যাল আউটপুটের ব্যবস্থা থাকে। ফলে উন্নত মানের বহিঃস্থ রেকর্ডিং ডিভাইস দিয়ে এই ৪:৪:৪ সিগনাল ধারণ করা সম্ভব।

৪:২:২ সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি। এই ক্রোমা সাবসেম্পলিং পদ্ধতিতে অর্ধেক কালার ইনফরমেশনকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে ৪ দ্বারা বোঝানো হচ্ছে ক্যামেরার সম্পূর্ণ লুমিনেন্স বা ব্রাইটনেস সিগন্যাল আর অর্ধেক কালার ইনফরমেশন ('২', '২') রেকর্ড করা হয়েছে। বর্তমানে বেশির ভাগ ভালো মানের হাইডেফিনেশন ভিডিও ক্যামেরায় এর প্রয়োগ দেখা যায়। আন্তর্জাতিক মানের স্ট্যান্ডার্ড কাজের ক্ষেত্রে কমপক্ষে এই পদ্ধতিতে দৃশ্যধারণ করতে হবে।

৪:২:০ পদ্ধতি ব্যবহারে ডেটা রেট আরও কমানো সম্ভব। এতে ব্রাইটনেসের তুলনায় এক-চতুর্থাংশ কালার ইনফরমেশন রেকর্ড করা হয়। DSLR ক্যামেরা এই পদ্ধতিতে রঙের তথ্য রেকর্ড করে।

৪:১:১ এই পদ্ধতিও ব্রাইটনেসের তুলনায় এক-চতুর্থাংশ কালার ইনফরমেশন রেকর্ড করে। যাবতীয় ডিভি ফরম্যাট ক্যামেরা, যেমন DV, DVCAM, DVCPRO এই কালার সেম্পলিং পদ্ধতিতে কাজ করে।

কোডেক (Codec)

কোডার-ডিকোডার (Coder-Decoder) থেকে উদ্ভূত কোডেক। এটি হলো একধরনের সফটওয়্যার, যার কাজ হলো ভিডিও ফাইলকে সংকুচিত করে আবার চালনাকালে ডিকোড করে দেখার উপযোগী করা। বাজারে অনেক ধরনের কোডেক পাওয়া যায়। গ্রহণযোগ্য কোডেক ইমেজের কোয়ালিটি ঠিক রেখে ফাইলের আকার সংকুচিত করে। উদাহরণ JPEG, TIFF, MPEG 4, MPEG 2, H.264, DivX, Apple ProRes। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের কোডেক পাওয়া যায়। প্রতিটি ক্যামেরায় নির্দিষ্ট কোডেক থাকে। ক্যামেরায় থাকা কোডেক পোস্ট-প্রোডাকশনে ব্যবহৃত কম্পিউটারে ইন্সটল করা থাকতে হবে। না হলে ভিডিও ফাইল প্লে করবে না। ইমেজের মান, ফাইলের আকার, কোন ডিভাইসে ভিডিও দেখানো হবে, এই সকল বিষয় বিবেচনা করে কোডেক নির্বাচন করতে হয়।

কোডেক- কোডার, ডিকোডার

ভিডিও ফাইল ফরম্যাট (Video File Format)

Container/ Wrapper	Full Name
.avi	Audio Video Interleave
.mxf	Material Exchange Format
.flv	Flash Video Format
.wmv	Windows Media Video
.mov	Apple QuickTime Movie
.mp4	Moving Pictures Expert Group 4

একটি ভিডিও ফাইল দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। কোডেক ও কন্টেইনার। কোডেক বিষয়ে আমরা ওপরে আলোচনা করেছি। অন্যদিকে কন্টেইনার ভিডিও, অডিও, সাবটাইটেলসহ অন্যান্য তথ্য সংরক্ষণ করে। সহজ ভাষায় বলা যায়, এটি হলো একটি ধারক, যার মধ্যে সংকুচিত অবস্থায় ভিডিও বা অডিও থাকবে। উদাহরণ mp4, mkv, mxf, avi, flv। বিভিন্ন ভিডিও ক্যামেরা বিভিন্ন ভিডিও ফাইল ফরম্যাট ব্যবহার করে। প্রতিটি কন্টেইনারে নির্দিষ্ট কোডেক থাকে, যার মাধ্যমে ফাইলটি এনকোড বা ডিকোড করা হয়। বেশির ভাগ ফাইল ফরম্যাট কন্টেইনারের নামানুসারে নামকরণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, moviename.mp4, এখানে কন্টেইনার এবং ভিডিও ফাইল ফরম্যাট হলো mp4. প্রদর্শনের চাহিদা অনুসারে ভিডিও ফাইল বিভিন্ন ফরম্যাট অনুসারে বিভক্ত করা হয়। ভিডিওটি ইউটিউবে নাকি টেলিভিশনে অথবা বড় স্ক্রিনে দেখানো হবে, সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী ফাইল ফরম্যাট নির্বাচন করতে হয়। যদিও ভিডিও ক্যামেরায় ফাইল ফরম্যাট নির্দিষ্ট থাকে। সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

রেকর্ডিং মিডিয়া (Storage Device)

ভিডিও ঐতিহ্যগতভাবে টেপে রেকর্ড করা হতো। টেপ থেকে ইমেজ কম্পিউটারে স্থানান্তর করতে হলে তথ্যকে অ্যানালগ থেকে ডিজিটালে রূপান্তর করতে হয়। এ জন্য বিশেষ হার্ডওয়্যারের প্রয়োজন হয়। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় ডিজিটাইজিং। বর্তমানে ডিজিটাল ভিডিও সংরক্ষণ করা হয় বিভিন্ন ধরনের স্টোরেজ ডিভাইসে। বিভিন্ন কোম্পানির ক্যামেরা নির্দিষ্ট কিছু ডিভাইসকে ব্যবহার করে। বহুল ব্যবহৃত কিছু স্টোরেজ ডিভাইস হলো S×S, P2, SD, SDHC, SHXC, হার্ডড্রাইভ।

প্রফেশনাল কাজে ব্যবহারের জন্য কার্ডের read এবং write স্পিড বিবেচনা করতে হয়। যত বেশি write স্পিড, তত দ্রুত ইমেজ কার্ডে সেভ হবে এবং উচ্চতর রেজল্যুশনের ইমেজ রেকর্ড করা সম্ভব হবে। অন্যদিকে read স্পিড বেশি হলে দ্রুত কার্ড থেকে ভিডিও ডাউনলোড করা যাবে কম্পিউটারে।

সেন্সর (Sensor)

ভিডিওর ইমেজে কোয়ালিটি অনেকটা সেন্সরের ওপর নির্ভরশীল। সিলিকন দিয়ে তৈরি ইমেজ সেন্সর হলো আলোক সংবেদনশীল একটি ডিভাইস। এটি লেন্স দিয়ে প্রবেশ করা আলোকশক্তিকে তড়িত শক্তিতে রূপান্তর করে। প্রতিটি ইমেজ সেন্সরে থাকে লাখো লাখো আলোক সংবেদনশীল ফটো ডায়োট বা পিক্সেল। ভিডিও ক্যামেরাতে কয়েক ধরনের সেন্সর ব্যবহার হয়।

সিসিডি (Charged Couple Device)

আলো বা ফোটন এসে সেন্সরের ফটোসাইট বা পিক্সেলে এসে পড়ার পর তা ইলেকট্রনিক চার্জে রূপান্তর হয়। এক্সপোজার শেষ হওয়ার পর ইলেকট্রিক চার্জকে অ্যানালগ ভোল্টেজে রূপান্তর করা হয়। তারপর এই ভোল্টেজ আউটপুট সেন্সরের বাইরের চিপ অ্যাপ্লিফায়ারে যায়। এখানে চার্জ পেকেট ম্যাগনিফাইড হয়ে সমানুপাতিক অ্যানালগ ভোল্টেজে পরিণত করা হয়। তারপর এই সিগন্যাল অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টারে যায়। এখানে অ্যানালগ ভোল্টেজকে ডিজিটাল নাম্বারে বা '০','১' বা বাইনারি সংখ্যার মাধ্যমে কম্পিউটারের বোধগম্য সিগন্যালে রূপান্তর বা কনভার্ট করা হয়। তারপর এই ডিজিটাল ডেটা মেমোরি ডিভাইসে সেভ হয়। সিসিডি থেকে যে সিগন্যাল পাওয়া যায়, সেটি হলো অ্যানালগ ভোল্টেজ । ক্যামেরায় অন্য চিপ থাকে, যেখানে এই সিগন্যালকে ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তর করা হয়। তাই বলা যায়, ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরায় ব্যবহৃত সিসিডি হলো অ্যানালগ ডিভাইস।

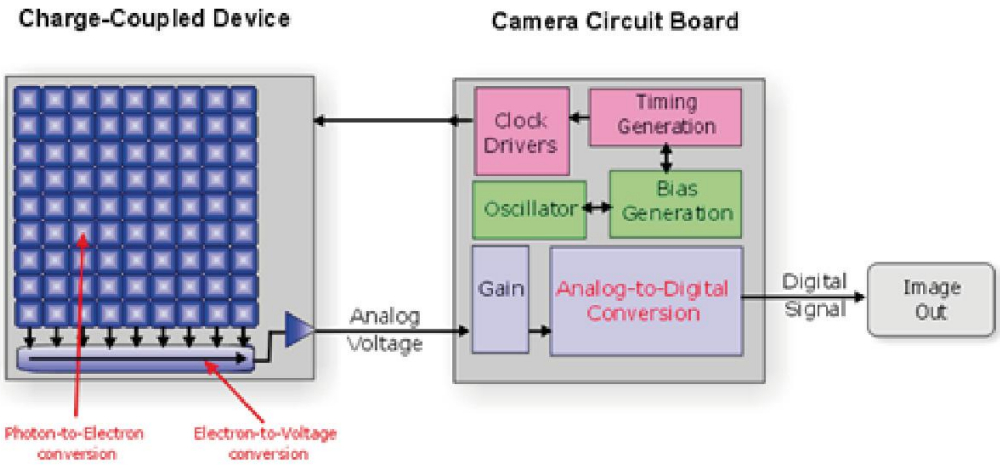

সিমোস (CMOS: Complementary Metal-oxide Semiconductor)

একটা সময় ছিল, যখন বেশির ভাগ ভিডিও ক্যামেরায় সিসিডি সেন্সর ব্যবহার হতো। এখন পরিস্থিতি পাল্টে ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরায় সিমোস সেন্সর ব্যবহার হচ্ছে। সিসিডি লাইটকে শুধু তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তর করে। অন্যদিকে, সিমোস

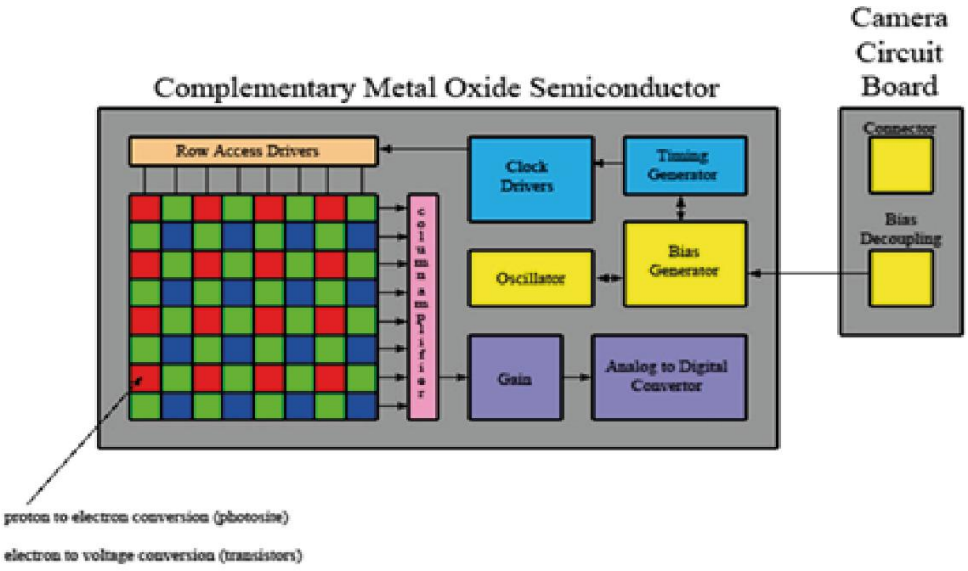

সেন্সর তুলনামূলকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সিমোস সেন্সরে সংযুক্ত আরও কিছু ইন্ট্রিগ্রেটেড সার্কিটের মাধ্যমে এটি প্রসেসিং এবং কন্ট্রোল ফাংশন থাকে। প্রত্যেকটি পিক্সেলেই আলাদা আলাদা আলোক সংবেদনশীল ফটোডায়োডের পাশাপাশি রিডআউট অ্যাম্পলিফায়ার থাকে। ফলে প্রত্যেকটি পিক্সেল সংগ্রহকৃত ইলেকট্রিক চার্জকে নিজেই অ্যাম্পলিফাইড ভোল্টেজে রূপান্তর করে । তারপর এই ভোল্টেজ রো এবং কলাম অনুসারে সেন্সরে থাকা অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টারে গিয়ে ডিজিটাল সংখ্যায় রূপান্তরিত হয়। এ কাজটি সেন্সরের অভ্যন্তরেই ঘটে বিধায় সিমোস বলা যায় ডিজিটাল ডিভাইস। সেন্সরের ক্ষেত্রে যে একটি বিষয় মাথায় রাখতে হয় তা হলো সেন্সরের এবং পিক্সেলের আকার। পিক্সেলের আকৃতি যদি বড় হয়, তবে সেন্সর আলোক সংবেদনশীল বেশি হয়। ফলে কম আলোতে দৃশ্য ধারণ করা যায়।

নয়েজ (Noise)

ডিজিটাল ভিডিওর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে একটি শব্দ–নয়েজ। কোনো শটে এটি থাকা মানে হলো ইমেজ কোয়ালিটির মান কমে যাওয়া। সাধারণত সেন্সরের সংবেদনশীলতা বাড়ানো হলে, অর্থাৎ আইএসও বাড়িয়ে দৃশ্য ধারণ করা

হলে ইমেজে নয়েজের ঝুঁকি বাড়ে। একটি ক্যামেরা কী পরিমাণ নয়েজ তৈরি করতে পারে, তা সেই ক্যামেরার Signal and Noise Ratio (S/N) থেকে জানা যায়। এটি ডিবি দিয়ে পরিমাপ করা হয়। যত বেশি সিগন্যাল ও নয়েজ রেশিও হবে, তত ভালো মানের ইমেজ পাওয়া যাবে। একটি মানসম্পন্ন ভিডিও ক্যামেরার S/N60 dB-এর বেশি হলে গ্রহণযোগ্য বলা যায়।

পরিশেষে, অনুধাবন করা যায়, ডিজিটাল ভিডিও সৃজনশীলদের জন্য আশীর্বাদ। বিশেষ করে চলচ্চিত্র শিক্ষার্থীদের জন্য তো বটেই। তারা এখন সহজেই সহজলভ্য ভিডিও ক্যামেরার সাহায্যে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে পারছে। তাদের সবার হাতে হাতে এখন স্মার্টফোন, ট্যাব, নোটবুক বা ল্যাপটপ। স্মার্টফোনের মতো সহজে বহনযোগ্য ডিভাইসে বর্তমানে উন্নত মানের ভিডিও রেকর্ড ও সম্পাদনা করা যায়। বলা যায়, এখন এমন একটা সময় বিরাজ করছে, যখন নির্মাতার ইচ্ছা, একাগ্রতা ও সততা থাকলে খুব কম বাজেটে আন্তর্জাতিক মানের ভিডিও প্রোডাকশন নির্মাণ সম্ভব। সেটা হোক ওয়েব সিরিজের জন্য বা টেলিভিশনের জন্য অথবা বড় পর্দার জন্য।

তথ্যসূত্র

- Hartwig, Robert L. Basic TV Technology : Digital and Analogue, Focal Press, 2005.
- Zettl, Herbert, Video Basics, Sixth Edition,Wadsworth, 2010.
- Weise, Marcus. How Video Works, Second Edition, Focal Press, 2007.
- Underdahl, Keith. Digital Video for Dummies,Third Edition, Wiley Publishing, 2003.
- Flynn, Deras TechTV's Guide to Creating Digital Video Like a Pro, Que, 2002.
- Braverman, Barry, Video Shooting Story Telling with HD Camera, Elsevier, 2010
- Brown, Blain. Film Makers Guide to Digital Imaging, Focal Press, 2015.

লেখক পরিচিতি

মুহাম্মদ ফেরদৌস আলম সিদ্দিকী : শিক্ষক, ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া বিভাগ, স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ। ferdous4422@gmail.com

ইলেকট্রনিক মিডিয়া : অজানা অধ্যায়

মাহমুদ হাফিজ

১৯৯৮ সাল। ওয়াসা ভবনের পনেরো বাই পনেরো ফুট আয়তনের ছোট্ট একটি রুম। রেডিমেড চেয়ার-টেবিল পেতে বসা উপস্থাপক। পেছনে নীল পর্দা টাঙানো। সামনে ট্রাইপডে বসানো ক্যামকর্ডার মানের সাধারণ ভিডিও ক্যামেরা। দুই হাত উঁচু করে লাইটম্যান মাথার ওপর ধরে রেখেছে 'সান গান'। মাঝেমধ্যেই তা আবার বিকল হয়ে পড়ছে। কক্ষজুড়ে নীরবতা। ক্যামেরা, লাইট, অ্যাকশন বলার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থাপক বলতে থাকেন, সুপ্রিয় দর্শক, শুরু হচ্ছে আমাদের চলমান ঘটনাভিত্তিক রিপোর্টিং ম্যাগাজিন–ঘটনা প্রবাহ।

ওপরের বর্ণনাটি গল্পের মতো মনে হলেও আজ থেকে চৌদ্দ বছর আগে এভাবেই বেসরকারি ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সংবাদ ও চলমান ঘটনাভিত্তিক অনুষ্ঠানের ধারাটির সূচনা হয়েছিল। দেশের গণমাধ্যম বিকাশে ইলেকট্রনিক মিডিয়া খুব অল্প সময়ে আজ যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাতে সূচনাকালের ঘটনা-অনুঘটনা বেমানান, হাস্যকর ও অপাঙ্‌ক্তেয়। যাঁরা এ পথের সূচনা করেছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জয়জয়কারেও আজ আর পাদপ্রদীপে নেই। ইতিহাসের অনিবার্য প্রয়োজন ও নতুন প্রজন্মকে ওয়াকিবহাল করার প্রয়োজনে কিছু স্মৃতিময় অভিজ্ঞতা তুলে ধরতেই এই লেখা।

দুই

১৯৯৭ সালের জুলাইয়ে এটিএন বাংলা সম্প্রচার শুরু হওয়ার কিছুদিন পর হোটেল শেরাটনে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। 'জনকণ্ঠে'র সিনিয়র সাংবাদিক হিসেবে কাভার করতে গিয়ে নতুন এই মিডিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্যোক্তাদের প্রশ্ন করছিলাম। যত দূর মনে পড়ে, দৈনিক 'ইত্তেফাকে'র তখনকার সিনিয়র রিপোর্টার রেজানুর রহমানও ('আনন্দ আলো' সম্পাদক) অনেকগুলো প্রশ্ন করেন। উদ্যোক্তারা কিছুটা বিব্রত। সংবাদ সম্মেলন শেষে এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান বলেন, সব প্রশ্নের জবাব এখানে দেওয়া যাবে না। অফিসে আসুন।

কিছুদিন পর অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অন্যতম উদ্যোক্তা মাহফুজুর রহমানের সাক্ষাৎকার নিতে ওয়াসা ভবনের এটিএন অফিসে যাই। সাক্ষাৎকার নেওয়ার পর আলাপচারিতার সময় প্রস্তাব দিলেন স্যাটেলাইটে সংবাদ ও চলমান ঘটনাভিত্তিক অনুষ্ঠান করা যায় কি না। সংবাদ ও চলমান ঘটনাভিত্তিক অনুষ্ঠানাদির পরিকল্পনা জমা দিয়ে সাংবাদিকতার পাশাপাশি কাজ করার অনুরোধও করলেন। 'জনকণ্ঠ' তখন দেশের শীর্ষ পত্রিকা। সেটি ছেড়ে করতে রাজি হলাম না। বললেন, ওই চাকরিতে থেকেও চুক্তিভিত্তিক কাজ করলে দোষের কী?

তখন দেশে বেসরকারি টিভি চালুর আইন নেই। সম্প্রচার যন্ত্রপাতি বা এসএনজি নেই। বিদেশে ক্যাসেট রপ্তানির অনুমোদন নিয়ে এটিএন চালানো হচ্ছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও ছায়াছবি কম্পিউটারে ডিজিটালাইজড করে বেটাকম ক্যাসেটে কম্পাইল করা হয়। পরে তা কুরিয়ারে থাইল্যান্ডে পাঠানো হয়। থাইল্যান্ডের 'থাইকম থ্রি' নামের একটি স্যাটেলাইট স্টেশনের উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে তা স্যাটেলাইটে পাঠানো হতো। আইনগত ও কারিগরি সীমাবদ্ধতায় সংবাদ বা চলতি ঘটনাভিত্তিক অনুষ্ঠান সম্প্রচার প্রায় অসম্ভব ছিল। এ কারণে শুরুর দিকে এটিএনের আট ঘণ্টার অনুষ্ঠানের ছয় ঘণ্টা জুড়ে থাকত পুরোনো বাংলা ছায়াছবি আর সিগারেট কোম্পানির বিজ্ঞাপন। বাকি দুই ঘণ্টা গান বা নাটক।

বিটিভির বাইরে মানুষ সংবাদ ও রিপোর্টিং-ভিত্তিক অনুষ্ঠান দেখার জন্য উন্মুখ ছিল। কয়েক দিন ভাবনাচিন্তার পর কয়েকটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা নিয়ে এটিএনে হাজির হলাম। পরিকল্পনা এটিএন কর্তৃপক্ষের যারপরনাই পছন্দ। তখন এটিএন বাংলার পদযাত্রায় জড়িয়েছেন চলচ্চিত্র পরিচালক মোহাম্মদ হান্নান, বিটিভির সাবেক কর্মকর্তা সরকার ফিরোজ, শামসুল হুদা, মাহবুবুল আলম, ব্যবসায়ী এনায়েতুর রহমান বাপ্পি (চ্যানেল নাইনের এমডি) প্রমুখ। সবাই মিলে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার রিপোর্টিং-ভিত্তিক প্রথম অনুষ্ঠানটির নাম ঠিক করলাম 'সমস্যার অন্তরালে'। তখন দেশজুড়ে বিদ্যুৎ-সংকট, পলিথিন সমস্যা, পরিবেশ সমস্যা, ঢাকা-কলকাতা বাস

চালু, ঋণখেলাপি ইত্যাদি ইস্যু বেশ চাঙা। আমরা একটি রিপোর্টিং দল তৈরি করলাম এবং একেক সপ্তাহে একেক সমস্যার ওপর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করে বেশ সাড়া ফেলে দিলাম। এ সময় বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার ইস্যুতে দেশ ছিল সরব। এসময় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সাক্ষাৎকার-সংবলিত 'আইনের শাসন' নামে তিন ঘণ্টার বিশেষ অনুষ্ঠান সমাদৃত হলো দর্শক মহলে। বেসরকারি টিভি ও স্যাটেলাইট চ্যানেলের ধারণা তখনো মানুষের কাছে নতুন। এটিএনের পরিচিতি তখনো সীমিত পরিসরে। কিন্তু চলতি সমস্যা ও টাটকা ইস্যুভিত্তিক রিপোর্টিং স্যাটেলাইটের পর্দায় দেখতে পেয়ে মানুষের মুখে মুখে এটিএন বাংলার নাম ছড়িয়ে পড়ল। এ সময় টাঙ্গাইলে শ্রমিক হিসেবে মানুষ বেচাকেনা নিয়ে তৈরি ডকুমেন্টারি 'মানুষের হাট' সম্প্রচার করে সাড়া ফেলে দিই। তবে এই সাড়া দেশজুড়ে হইচইয়ের মতো নয়। তখন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দর্শক এত বেশি ছিল না, তাই সুশীল সমাজে আলোচনা হলেও দেশজুড়ে আলোচনার ঝড় বইত না।

তিন

এসব অনুষ্ঠান পরিচালনা, উপস্থাপনা ও গ্রন্থনার সুবাদে কিছু ডকুমেন্টারি তৈরি করে প্রচারের সুযোগ পাই। সেগুলো বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নির্মিত হলেও মানুষের মনে জায়গা পেল। আমাদের সাহস বেড়ে গেল। একুশে টেলিভিশনের তুমুল জনপ্রিয়তা ও সাইমন ড্রিং-তখনও অন্যতম আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠেনি। সময়টা ২০০০ সালের শুরুর দিক। একুশে টিভি সম্প্রচারে আসবে আসবে করছে। এর আগেই আমাদের রিপোর্টিং-ভিত্তিক সম্প্রচার শুরু করার তাড়া। আকস্মিকই সাহস নিয়ে বিবিসি-সিএনএনের অনুসরণে রিপোর্টিং ম্যাগাজিন 'ঘটনা প্রবাহ' প্রচার শুরু করে দিলাম। উপমহাদেশের প্রখ্যাত শানাইবাদক বিসমিল্লাহ খান বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন এ সময়। তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে একরকম জোর করেই ঢুকে পড়লাম মহাখালী ব্র্যাক ইন হোটেলের কক্ষে। সঙ্গে ফখরুল আবেদীন দুলাল ও তাশিক আহমেদ। দুজনই এটিএন বাংলায় সদ্য যোগ দিয়েছেন কর্মকর্তা হিসেবে। আমি 'ঘটনা প্রবাহে'র পরিচালক। হাতের কাছে রিপোর্টার না পেয়ে তাশিক আহমেদকেই অনুরোধ করলাম। তাশিক ইংরেজি-হিন্দী মিলিয়ে খান সাহেবের সাক্ষাৎকার নিলেন। বিসমিল্লাহ খানের ঢাকা আগমনের ওপর বিস্তারিত প্রতিবেদনসহ সপ্তাহের অন্য খবরাখবর নিয়ে প্রথম সম্প্রচারিত হলো 'ঘটনা প্রবাহ'।

সংবাদ প্রচারের অনুমতি ও এসএনজির মতো লাইভ সাজসরঞ্জাম না থাকায় সপ্তাহান্তে কুরিয়ারে থাইল্যান্ডে ক্যাসেট পাঠানোর ওপর ভিত্তি করেই চলতে থাকল আমাদের সংবাদ। সংবাদ না বলে নাম দিলাম চলতি ঘটনাভিত্তিক রিপোর্টিং ম্যাগাজিন। সপ্তাহজুড়ে ঘটে যাওয়া চলতি ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভিডিওতে ধারণ

করে নিয়ে আসতাম। অকুস্থলে 'পিটিসি' দিত আমাদের রিপোর্টিং টিমের কেউ। পরে স্টুডিওতে সংবাদ পড়ে সংবাদের শেষে জুড়ে দেওয়া হতো পুরো রিপোর্টিংটি। এই পদ্ধতি বেশ সাড়া ফেলল নতুন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ধারাটিতে। একেকবার তিন-চারটি করে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন সম্প্রচার করতাম।

এখনকার মতো আনকোরা গাড়ি, নতুন ও আধুনিক ক্যামেরা, আধুনিক এডিটিং প্যানেল, লাইভ ব্রডকাস্টিংয়ের সরঞ্জাম, অটোকিউ বা অক্টোপাসের মতো আধুনিক সরঞ্জাম বা সফটওয়্যারের কিছুই ছিল না। খবর পড়ার জন্য অটোকিউয়ের জায়গায় বাজার থেকে ঢাউস আকারের সাদা কাগজের শিট আর আর্টপেন কিনে আনতাম। খবর পাঠকের পড়ার অংশটা মোটা অক্ষরে লিখে ক্যামেরার পেছনে ধরে রাখা হতো। ক্যামেরার লেন্সের ওপরে থাকায় রেকর্ডিংয়ের পর অনেক সময় দেখা যেত খবর পাঠক-পাঠিকা আকাশের দিকে তাকিয়ে খবর পড়ছে। আলো-ঝলমলে লাইভ নিউজ কক্ষের বদলে সাধারণ কক্ষে সানগানের আলো ধরে রেকর্ডিং করতাম। পেছনের দিকে নীল পর্দা টাঙিয়ে নিতাম। পরে এডিটিংয়ের সময় তা কেটে দিয়ে 'ক্রোমা' করে পাঠক-পাঠিকার পেছন দিয়ে ঘটনার ভিডিও ফুটেজ চালিয়ে দেওয়া হতো।

এ সময় খবর পাঠ করার জন্য আমার নতুন মুখ আর সুন্দর কণ্ঠের জন্য যে দুজনকে খুঁজে বের করেছিলাম, তাঁরা হচ্ছেন এম ওবায়দুর রহমান (বর্তমানে এটিএন বাংলার নির্বাহী প্রযোজক ও সংবাদ পাঠক), অনুপমা আচার্য (বেতারের খবর পাঠক)। পরে অবশ্য এই দলে যোগ দেন শায়লা মনজুর (কানাডাপ্রবাসী), রুপা চক্রবর্তী (আবৃত্তিশিল্পী), শবনম ফেরদৌসী (শর্টফিল্ম নির্মাতা)।

চার

'ঘটনা প্রবাহ'র মাধ্যমেই দেশের ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংবাদের সূচনা। ২০০১ সালের আগস্ট মাসে এটিএন সংবাদ সম্প্রচারের অনুমোদন পাওয়ার পূর্বপর্যন্ত 'ঘটনা প্রবাহ'ই ছিল এটিএনের সংবাদভিত্তিক অনুষ্ঠান। এমনকি বেশ কিছুদিন নিয়মিত সংবাদও চলেছে ঘটনা প্রবাহ নামে। এই ঘটনা প্রবাহে একটি চমৎকার রিপোর্টিং টিম তৈরি হয়েছিল। তাদের অনেকে মিডিয়ার লাইমলাইটের বাইরে, অনেকে মিডিয়াতেই হাতযশ করছেন। 'ঘটনা প্রবাহ' রিপোর্টিং ম্যাগাজিনে কাজ করে, যাঁরা দেশের ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংবাদ সম্প্রচারের ইতিহাসে পথিকৃৎ দলের সদস্য হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে অনুজতুল্য আবু দারদা জোবায়ের (এটিএন বাংলা), মনিউর রহমান (চিফ রিপোর্টার, এটিএন বাংলা), নাশরাত চৌধুরী (প্রবাসী), মজিবর রহমান (স্পোর্টস এডিটর, জনকণ্ঠ), মনিজা রহমান (যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী সাংবাদিক), মাকসুদা লিসা (ক্রীড়া সাংবাদিক), আসমাউল হুসনা

(গৃহবধূ), শবনম ফেরদৌসী (শর্টফিল্ম নির্মাতা, প্রযোজক একাত্তর টিভি), ডাবলু চৌধুরী প্রমুখ।

'ঘটনা প্রবাহ'র ক্যামেরা টিমে সাধারণ মানের ক্যামেরা হাতে দারুণ সব কাজের পুরোভাগে থাকতেন ক্যামেরাম্যান রাজু, রিপন শেখ, জিয়া জহির পল্লব। মোকাদ্দেম বাবু, মুরাদ, রাসেল, জিল্লুর মতো সহকারীরা। এখন পুরো পরিচালক শামীম, নাজিরের মতো ক্যামেরা সহকারীর জুড়ি ছিল না। রাশি রাশি ভিডিও ফুটেজ থেকে প্রত্যাশিত ভিডিও চিত্র এডিটিংয়ে মানস মুখার্জী, সাধন, শংকর, মেহেদী তখন শ্রমের মূল্য পাননি। এখন তাঁরা এটিএনেরই বড় বড় পদে। আর সারা সপ্তাহের ঘটনার পেছনে ছোটাছুটির জন্য ভাঙাচোরা দুটি মাইক্রোবাসে আমাদের টিমকে নিয়ে ছুটতেন ড্রাইভার মোখলেস ও মান্নান।

কিছুদিনের মধ্যে একুশে টিভির একঝাঁক সাংবাদিকের মাধ্যমে টেরিস্ট্রেরিয়াল পদ্ধতিতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় সংবাদ প্রচার শুরু হওয়ার পরও 'ঘটনা প্রবাহ' কিছুদিন চালিয়েছি। এটিএন বাংলার পক্ষ থেকে সমান্তরালে চলেছে সংবাদ অনুমোদন পাওয়ার চেষ্টা। 'ঘটনা প্রবাহ'র টিমের সঙ্গে মোসাদ্দেক আল মাহমুদ, নাজমুল হক সৈকত, রুমানা রুমিসহ নতুন সাংবাদিক-কর্মী নিয়ে এটিএনের সংবাদ শুরুর আয়োজন হয়। এটিএন চেয়ারম্যান আমাকে 'জনকণ্ঠে'র চাকরি ছেড়ে সংবাদের পুরো দায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধ জানান। কৌশলগত কারণে চাকরি ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। চার বছর এটিএন বাংলার সুখ-দুঃখে জড়িত ছিলাম চুক্তির আওতায়। কিন্তু এটিএন অনুমোদন নিয়ে পুরোমাত্রায় সংবাদ শুরুর আয়োজন করলে সেই যাত্রায় শামিল হতে পারিনি। কর্তৃপক্ষ অবশ্য 'ঘটনা প্রবাহ'সহ অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকার অনুরোধ করে। তত দিনে একুশে টিভির সংবাদ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ফরিদুর রেজা সাগর ভাই এটিএন বাংলায় 'ইমপ্রেস টেলিটাইম' নামের চাংকে নানা অনুষ্ঠান চালানো বাদ দিয়ে 'চ্যানেল আই' চালু করে লাইভ সংবাদ শুরু করে দিয়েছেন। এ অবস্থায় সাপ্তাহিক আকারে 'ঘটনা প্রবাহ' চালানোর আবেদন ছিল না বলে এটি আর পরিচালনা করতে চাইনি। তবে এটিএন জনপ্রিয় ঘটনাভিত্তিক রিপোর্টিং ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানটি বহুদিন ধরে রেখেছিল। পরিচালনা করতেন তাশিক আহমেদ।

চার বছরের শ্রম ও ঘাম দিয়ে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় চলতি ঘটনাভিত্তিক অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রচারকে এগিয়ে নিয়ে এলেও ফুলটাইম যোগ দিতে না পারায় ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকে ছিটকে পড়ি। এ সময় সাংবাদিক নঈম নিজাম এটিএনের সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান পরিচালনা কমিয়ে দিয়ে সংবাদ সম্প্রচারের অগ্রযাত্রায় শামিল হন। আগেই জয়েন করিয়ে দিয়েছিলাম সাংবাদিক মোসাদ্দেক আল মাহমুদকে। শুরু হয় সংবাদ।

এটিএন তথা ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকে আমার এই প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে 'ঘটনা প্রবাহ'র টিমের অনেকেই ছিটকে পড়েন।

পাঁচ

স্যাটেলাইট মিডিয়ার জগতে এখন টক শোর জয়জয়কার। কিন্তু প্রথম টকশোর নাম ছিল 'সমসাময়িক'। এই নাম ঠিক করেছিলাম বনানীর ইকবাল সেন্টারের হোটেল 'বুখারা'র এক ডিনারে। এটিএনের তখনকার অর্থ পরিচালক এনায়েতুর রহমান বাপ্পীর সঙ্গে টক শো শুরুর বাজেট নিয়ে অনেক দিন থেকেই আলাপ করছিলাম। তিনি ডিনারে ডাকলেন বুখারায়। ওইখানে নাম ঠিক করে পরের সপ্তাহ থেকে চলতি ঘটনাভিত্তিক টক শো 'সমসাময়িক' প্রচার হতে শুরু হলো। প্রথম বেশ কয়েক মাস অনুষ্ঠান উপস্থাপনা ও পরিচালনা করার পর একটি কর্মসূচিতে বিদেশে যাই। তখন এটিএনে কর্মরত সাংবাদিক নঈম নিজামও এই টক শো উপস্থাপনা করেন। পরে যত মিডিয়া আসতে লাগল, একই আদলে, ততই টক শোর সংখ্যা বাড়তে থাকল। আজ এ সংখ্যা আর হাতে গোনা যায় না।

ছয়.

ইলেকট্রনিক মিডিয়া এখন যাঁরা শাসন করছেন, তাঁদের প্রায় সবার সঙ্গেই এই মিডিয়া নিয়ে ইন্টার‍্যাকশন করেছি। এ মিডিয়া নিয়ে আগেভাগে কাজ শুরু করার সুবাদে। কয়েকটি ঘটনা স্মৃতিপটে খুব ভাসে। দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশের আয়োজনের মধ্যে যমুনা গ্রুপের পক্ষ থেকে ডাক আসে প্রকাশিতব্য পত্রিকার ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের। সময়টা সম্ভবত ২০০০ সালের জানুয়ারি। দলবল নিয়ে এক রাতে হাজির হই 'যুগান্তরে'র অফিসে। গভীর রাত অবধি 'যুগান্তরে'র আধুনিক বার্তা বিভাগ, পেস্টিং পদ্ধতি ও ঢাউস মেশিনে প্রিন্টিং রেকর্ডিংয়ের পর প্রয়াত সম্পাদক গোলাম সারওয়ার, বার্তা সম্পাদক মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, চিফ রিপোর্টার সাইফুল আলমের ইন্টারভিউ নিয়ে যখন চলে আসছি, তখন ডাকলেন বুলবুল ভাই। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমার ধারণা জানতে চাইলেন।

কাজ সেরে প্রায় রাতেই এটিএন বাংলার অফিসে এডিটিং তদারকির জন্য দৌড়ানো জনকণ্ঠ কর্তৃপক্ষ ও সহকর্মীদের কাছে ওপেন-সিক্রেট বিষয় ছিল। প্রায়ই সহকর্মী হাসনাইন খুরশেদ সূচি এডিটিং-রেকর্ডিং সম্পর্কে জানতে চাইতেন। তাঁর প্রবল আগ্রহে এটিএন বাংলার এডিটিং দেখাতে দুয়েকবার তাঁকে নিয়েও গিয়েছিলাম। মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল ও হাসনাইন খুরশেদের দূরদৃষ্টি আমাকে আজও চমকিত করে। কারণ, মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল ও হাসনাইন খুরশেদ দুজনই আজ

ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যক্তিত্ব।

'জনকণ্ঠ'-তে আমার অগ্রজ সাংবাদিক সহকর্মী খায়রুল আনোয়ার মুকুল, মোস্তফা ফিরোজ, রেজোয়ানুল হক রাজা, জহিরুল হকও মাঝেমধ্যে ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ে নানা বিষয় জানতে চাইতেন, আলাপ করতেন, এঁদের সবাই এখন ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও তারকা।

লেখক পরিচিতি

মাহমুদ হাফিজ : কবি, সিনিয়র সাংবাদিক। প্রদায়ক সম্পাদক, *দৈনিক আমাদের নতুন সময়।*

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রে (১৯৭২-৭৫) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থাপন

শুভ কর্মকার

ভূমিকা

ইতিহাসকে ধারণ করা, মানুষকে বিনোদন দেওয়া, সচেতন করে তোলা, শিক্ষা প্রদান করা, সর্বোপরি মানুষকে প্রভাবিত করা চলচ্চিত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য। তবে ইতিহাসভিত্তিক চলচ্চিত্রের অধিকাংশই নির্মিত হয়েছে আদর্শের ওপর ভর করে। অবশ্য বাণিজ্যিক চিন্তা একদমই যে ওতে নেই, তেমনটি নয়। পুঁজি বিনিয়োগের কারণে অজান্তেই প্রযোজকের মনে অর্থের প্রশ্নটি সামনে চলে আসে। সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে মনের ইচ্ছার প্রকাশ ঘটাতে এবং ইতিহাসকে ধারণ করতে কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প রচিত হয়েছে। এই ধারায় চলচ্চিত্র পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্মের পেছনের মূল শক্তিই হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ। নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা বাঙালির শিল্পধারায় নবলব্ধ অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর। স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে উপন্যাস, নাটক, কবিতা, চিত্রকলার পাশাপাশি নির্মিত হয়েছে চলচ্চিত্রও। বাংলাদেশের

৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

স্বাধীনতাযুদ্ধ নয় মাস ধরে চলে। এ নয় মাসের স্বাধীনতাযুদ্ধকে কেন্দ্র করে যে সকল চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে, সেগুলোকে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র হিসেবে অভিহিত করা হয়। যদিও বাঙালি জাতির মুক্তিযুদ্ধের লড়াই ও সংগ্রাম চলেছে শতাব্দীর পর শতাব্দীজুড়ে। কিন্তু সেই লড়াই-সংগ্রামের ফলাফল আমরা পেয়েছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে। মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন থেকে শুরু করে সকল পরিবেশে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন, তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ছেষট্টির ছয় দফা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথকে করেছে প্রশস্ত। ওই প্রশস্ত পথের নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সাতই মার্চের ভাষণ বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে অনানুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূল বীজ এ ভাষণেই নিহিত ছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই ঐতিহাসিক ভাষণের উক্তি, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বন্দী থাকলেও তাঁর আদর্শ, তাঁর নেতৃত্বে বেগবান হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার কোনো উপায় নেই। আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কীভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, সেটা অনুসন্ধান করা। এ ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনকালে মুক্তিপ্রাপ্ত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রগুলো এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ, তাঁকে নিয়ে দেওয়া স্লোগান, তাঁর ছবি বা ভিডিওর উপস্থাপন, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাঁকে কোন দৃষ্টিতে দেখছে, এ দেশের মানুষ তাঁকে কীভাবে দেখছে ইত্যাদি বিষয়গুলো অনুসন্ধান করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির পিতা এবং বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি। তিনি ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান ছিলেন গোপালগঞ্জ দেওয়ানি আদালতের সেরেস্তাদার এবং মা সায়েরা খাতুন গৃহিণী। ছয় ভাইবোনের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৃতীয় এবং স্বভাবতই নেতৃত্ব দেওয়ার মতো গুণাবলির অধিকারী। শোনা যায়, গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে থাকা অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওই এলাকার অনুন্নত অবস্থার প্রতি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বিক্ষোভ সংগঠিত করেছিলেন। (রশীদ, ২০১৫)

নেতৃত্ব প্রদানের এই গুণাবলি ও স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মনে বীজ হিসেবে রোপিত হয়েছিল অনেক আগেই। ১৯৫৬ সালের

সেপ্টেম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত এক ভাষণে সেটা আবারও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি ছিলেন সকল বঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে। এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র আবার চাপিয়ে দেওয়ার যে কোনো প্রচেষ্টা সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করা হবে। বাঙালিরা দেশের মোট জনসংখ্যার ৫৬ ভাগ। রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমি জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব চাই।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক মওলানা ভাসানী

নির্বাচনের ভিত্তি হতে হবে এক লোক এক ভোট। (হোসেন ২০১৩, পৃ. ৩৫)

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক শিষ্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সোহরাওয়ার্দী ছাড়াও শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানীর আন্তরিক সাহচর্য পেয়েছেন তিনি। ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী মারা গেলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে শূন্যতা বিরাজ করে। এই শূন্যতা পূরণে এগিয়ে আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১১ দফার কর্মসূচি দেয়। এই ১১ দফাতেই ৬৬-র ৬ দফার মূল ভিত্তি নিহিত ছিল। (সুলতান ২০১০, পৃ. ৩১)

১৯৬৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এক বক্তৃতায় বলেন–

রাষ্ট্র পরিচালনার মোট পাঁচটি মূল স্তম্ভ থাকে। এগুলো হচ্ছে রাজধানী, কেন্দ্রীয় সরকার, দেশরক্ষা, মূলধন ও রাজনৈতিক ক্ষমতা। ১২শ' কোটি টাকা ব্যয়ে করাচিতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করার পর তা পশ্চিম পাকিস্তানকে ছেড়ে দিয়ে ৫শ' কোটি টাকা ব্যয়ে ইসলামাবাদে নতুন রাজধানী তৈরি করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে শতকরা ৯৫ জন পশ্চিম পাকিস্তানি। দেশরক্ষা খাতে জাতীয় বাজেটের শতকরা ৬০ ভাগ ব্যয় হয়। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সদর দফতর এবং অস্ত্র নির্মাণ কারখানা সবই পশ্চিম পাকিস্তানে। মূলধন কেন্দ্রীভূত দেশের বিশটি পরিবারের হাতে। এদের মধ্যে একটিও বাঙালি নেই। রাজনৈতিক ক্ষমতা

থেকেও বঞ্চিত বাংলার মানুষ। বাংলার মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানের কলোনির বাসিন্দা ছাড়া আর কিছু নয়–তাদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে বাজার হিসেবে।' (হোসেন ২০১৩, পৃ. ৪৮)

পূর্ব বাংলার প্রতি এই বৈষম্যনীতি প্রতিকারকল্পে ও পূর্ব বাংলার স্বাধিকারের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ৬ দফা দাবি উত্থাপন করে। ৬ দফা আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। সরকারের বিরোধিতার পাশাপাশি ৬ দফা দাবির সমালোচনা করেন মওলানা ভাসানীসহ অনেক রাজনৈতিক নেতা। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিযুক্ত করা, পত্রপত্রিকায় মুজিব-বিরোধী সংবাদ প্রকাশ করে তৎকালীন পাকিস্তানি সরকার চাপ সৃষ্টি করছিল। সেই সময়ের স্লোগানই ছিল এমন- 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো: বীর বাঙ্গালি অস্ত্র ধর–বাংলাদেশ স্বাধীন কর।' 'জেলের তালা ভাঙবো–শেখ মুজিবকে আনবো।' বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতীক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার চরম অভিব্যক্তি দেখা যায় এই স্লোগানে–'জয় বাংলা, তোমার দেশ আমার দেশ–বাংলাদেশ বাংলাদেশ।' (সুলতান ২০১০)

ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য সভার আয়োজন করে। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি তোফায়েল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৭০-এর জাতীয় নির্বাচনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়েছে ১৬৭টি আসনে। (চৌধুরী ২০০১, পৃ. ১১১)

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ইয়াহিয়া খান দশ নেতার বৈঠক আহ্বান করলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তা প্রত্যাখ্যান করেন। ৬ মার্চ ১৯৭১ ইয়াহিয়া খান বেতার ভাষণে বলেন, ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে (হোসেন ২০১৩, পৃ. ৯৫)। কিন্তু অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের নয়া গভর্নর হিসেবে টিক্কা খানকে বাংলায় পাঠানো হয়। সারা দেশের মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দিকে তাকিয়ে থাকে। অবশেষে ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এই ভাষণ বাংলাদেশের অনানুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণা।

১৬ ও ১৭ মার্চের প্রহসনমূলক আলোচনা, ১৯ ও ২০ মার্চের ফলাফলবিহীন আলোচনা মূলত ছিল কালক্ষেপণ করা এবং পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য ও রসদ আমদানি করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। ২৩ মার্চ 'পাকিস্তান দিবস'-এ পতাকা তুলতে বললে

ছাত্রলীগের সদস্যরা পল্টন ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে (সুলতান ২০১০, পৃ. ৮৫)। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনেও বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ২৫ মার্চ ইয়াহিয়ার জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার কথা থাকলেও তিনি দেননি। বরং রাতের আঁধারে বাঙালিদের ওপর নির্বিচার গুলি চালানোর আদেশ দেন। ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেপ্তার হবার পূর্বে দিবাগত রাত বারোটার পরপরই স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। এই সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশে চলে নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। অবশেষে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেয়ে বাংলাদেশের মাটিতে ফিরে আসেন। কিন্তু এ দেশের কিছু কুলাঙ্গার ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যা করে।

তিনি মারা গেলেও তাঁর আদর্শ ছড়িয়ে পড়ে দেশ থেকে বিদেশে। বিদেশের মানুষও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করে। বৈমানিক আলমগীর সাত্তার, বীর প্রতীক বিদেশে থাকা অবস্থায় এ বিষয়ে বেশ কিছু অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। সেখান থেকে কয়েকটি অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হলো। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর দুবাই বিমানবন্দরে আলমগীর সাত্তার (১৯৯৭) তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ঘটে যাওয়া অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, বিমানবন্দরে (দুবাই) পাকিস্তানি চলচ্চিত্র অভিনেতা কামাল বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার জন্যে সমস্ত বাঙালি জাতিকে গাল দিয়েছিলেন। (সাত্তার ১৯৯৭, পৃ. ২১)

আলমগীর সাত্তারের (১৯৯৭) জীবনে ঘটে যাওয়া আরো দুটি ঘটনা তুলে ধরা হলো। প্রথমত, ১৯৭৫ সালে নিউইয়র্কে বিমান চালানোর ট্রেনিংয়ের সময় সাত্তারের আফ্রো-আমেরিকান প্রশিক্ষক সাত্তারের পরিচয় পেয়েই বলে উঠেছিলেন, 'ইউ বাস্টার্ড, ইউ কিলড মুজিব।' দ্বিতীয়ত, কেনেডি বিমানবন্দর থেকে হোটেলে যাওয়ার সময় ইসরায়েলি ড্রাইভার বলে ওঠেন, 'আই ডোন্ট টক উইথ ইউ। ইউ কিলড শেখ মুজিব।'

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির প্রতি দীর্ঘকালের শোষণ-বঞ্চনার প্রতিবাদ। বাঙালি জাতিকে শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তি দিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সাতই মার্চের ভাষণে বলেই দিলেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে এবং তাঁর আদর্শে বাংলার মানুষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আদর্শের জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন। জেল-জুলুম তাঁকে এতটুকু টলাতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানি জান্তা সরকার বিভিন্নভাবে

বোঝাতে চেষ্টা করত যে তিনি 'মুর্শিদাবাদের অমুক'। সেদিনের শেখ মুজিব এসব অপপ্রচার, কুৎসাকে মোকাবিলা করেই 'বঙ্গবন্ধু' হয়েছিলেন। একটি বিষয় স্পষ্ট, পাকিস্তান আমলের গোটা সময়টাজুড়ে সামরিক শাসক, স্বৈরশাসন ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রের প্রধান টার্গেট ছিলেন সেদিনের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। (আলমগীর, ২০১৪, পৃ. ৬)

পাকিস্তানি শাসকের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যাঁর অবদান অনস্বীকার্য, তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ছয় দফা থেকে শুরু করে সাতই মার্চের ভাষণ বাঙালি জাতিকে মুক্তির আন্দোলন গড়ে তুলতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান চলচ্চিত্রে কীভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, এমন তাড়না থেকেই বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। শুধু প্রচার নয়, মানুষের মনে গভীর প্রভাব তৈরি করতে চলচ্চিত্রের ভূমিকা বলার অপেক্ষা রাখে না। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রে বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কীভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, সেটা আলোচ্য প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ এবং গণ-আন্দোলন নিয়ে অনেক চলচ্চিত্রই নির্মিত হয়েছে। গণ-আন্দোলন বা যুদ্ধের সমসাময়িক সময়ই শুধু নয়, যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পঞ্চাশ বছর পরও এ-বিষয়ক চলচ্চিত্র নির্মিত হবার নজির রয়েছে। বিশ্বে যুদ্ধ নিয়ে যে সকল বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম ব্রিজ অন দ্য রিভার কাওয়াই, ব্যাটল ফর বার্লিন, গানস অব নাভারন, লংগেস্ট হান্ড্রেড মাইলস, সানফ্লাওয়ার প্রভৃতি। (হাসান ২০০৬, পৃ. ৫১৬)

বাঙালি জাতিকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আত্মমর্যাদার জন্য আন্দোলন ও যুদ্ধ করতে হয়েছে। দীর্ঘকালের সংগ্রামের ফলাফল ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। এ যুদ্ধ শুধু স্বাধীনতাসংগ্রাম নয়, হাজার বছরের গ্লানি, শোষণ, বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। মুক্তিযুদ্ধের এই চিন্তাচেতনা ও সংগ্রামের ইতিহাস বাঙালির প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরের অন্যতম মাধ্যম হতে পারে চলচ্চিত্র। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্রের মতো বাংলাদেশেও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অসংখ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। বিষয়বস্তু বা আঙ্গিকগত শিল্প বিচারে বিশ্বমানের নান্দনিক সমৃদ্ধি অর্জন না করলেও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণের একটা ক্ষীণ প্রয়াস ও প্রবণতা ১৯৭১-পরবর্তী সময় থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশে অব্যাহত রয়েছে। (ইসলাম ২০০৮, পৃ. ১৪১)

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নিয়ে গবেষণা হয়েছে অনেক। তবে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রে বঙ্গবন্ধুর উপস্থাপন অপ্রতুল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাবেরী

গায়েন 'মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণ' শীর্ষক গবেষণা করেন। এখানে শুধু নারীর উপস্থাপন পর্যালোচনা করা হয়েছে। খন্দকার মাহমুদুল হাসান রচিত চলচ্চিত্র গ্রন্থে 'গণ-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ছায়াছবি' নিয়ে বিস্তর আলোচনা রয়েছে। এখানে মূলত মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রগুলো কীভাবে নির্মাণ করা হয়েছে এবং নির্মাণের পেছনের গল্পগুলো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ২০০৮ সালে আহমেদ আমিনুল ইসলাম রচিত বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর্থসামাজিক পটভূমি গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল ডিসেম্বর ২০১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত শৈবাল চৌধুরীর প্রবন্ধ 'যুদ্ধশিশু : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটি নতুন ছবি'। এখানে যুদ্ধশিশু চলচ্চিত্রটি পর্যালোচনা করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এ রকম অসংখ্য লেখা রয়েছে। এ সকল প্রবন্ধ থেকে বর্তমান গবেষণাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থাপন পর্যালোচনা করা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে।

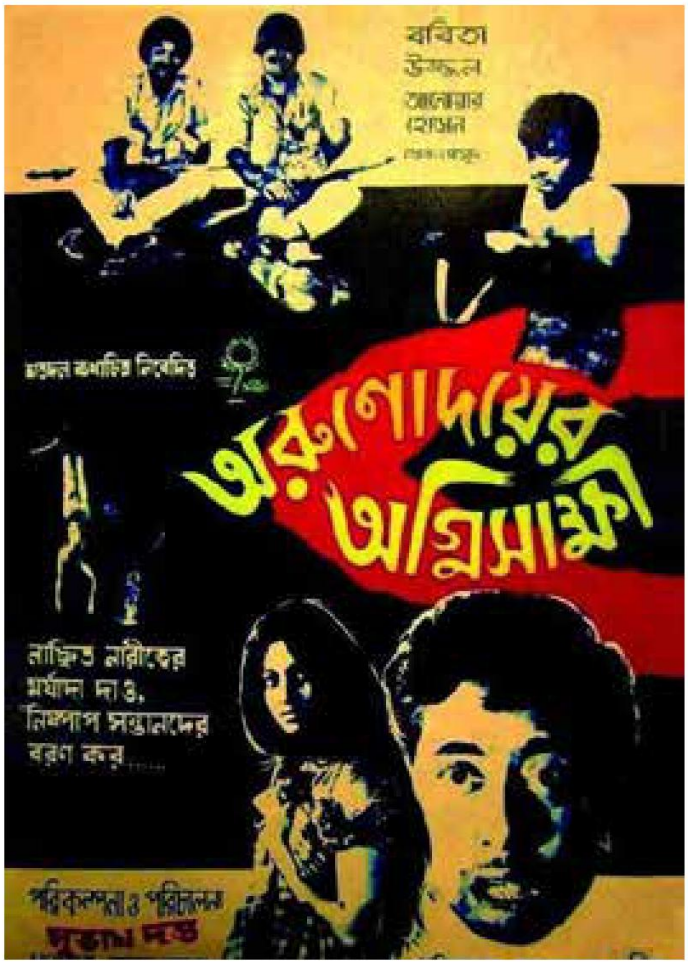

অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী চলচ্চিত্রের পোস্টার

গবেষণা পদ্ধতি

চলচ্চিত্র সমালোচনার মধ্য দিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রের বিনির্মাণ ও রচয়িতার পুনর্নির্মাণ করা হয়। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনার মৌলিক বিষয় চলচ্চিত্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থাপন। সাধারণত চলচ্চিত্র বিশ্লেষণে আধেয় ও

আধার নিয়ে গভীর পর্যালোচনা করা হয়। আধেয় বিশ্লেষণে নির্মাতার চিন্তা, শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজবাস্তবতা ও সময়ের সন্ধান পাওয়া যায়। আধেয় যে আধারে নির্মিত হয়েছে, সেই আধার বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে দৃশ্য-সংগঠন, ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল, কম্পোজিশন, ডিটেইল, চিহ্ন, পটভূমি বিশ্লেষণ করা হয়। বর্তমান প্রবন্ধে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রে গুণগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থাপন পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রাম শুরু হয়েছিল যেমন অনেক আগে, তেমনই মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রও প্রথম নির্মিত হয় ১৯৭০ সালে। জহির রায়হানের *জীবন থেকে নেয়া* চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের প্রথম রাজনৈতিক চলচ্চিত্র। এখানে প্রত্যক্ষ ভাবে মুক্তিযুদ্ধের কোনো বিষয় না থাকলেও এই চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য তৈরি হতে সাহায্য করেছিল (হাসান ২০০৬, পৃ. ৫১৭)। উল্লিখিত কারণে বর্তমান প্রবন্ধে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক চলচ্চিত্রের সূচনাকাল ১৯৭২ থেকে ধরা হয়েছে।

আলোচ্য প্রবন্ধে নমুনা চলচ্চিত্র হিসেবে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত নির্মিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রগুলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত মোট ১১টি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছে (গায়েন ২০১৩, পৃ. ১৮২)। এর মধ্যে *বাঘা বাঙ্গালী*, *জয় বাংলা*, *আবার তোরা মানুষ হ*, *ধীরে বহে মেঘনা*, *কার হাসি কে হাসে* এই পাঁচটি চলচ্চিত্র সংগ্রহ করা যায়নি। *ওরা ১১ জন*, *রক্তাক্ত বাংলা*, *অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী*, *আমার জন্মভূমি*, *আলোর মিছিল*, *সংগ্রাম* এই ছয়টি চলচ্চিত্র বর্তমান প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ওরা ১১ জন চলচ্চিত্রের পোস্টার

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থাপন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগণ্য নায়ক। নিজের কথা চিন্তা না

করে তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ করেছেন। হাজার বছরের পরাধীনতা থেকে বাংলার মানুষের মুক্তির আলোকবর্তিকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অনেক নেতা, নবাব, সুলতান, সম্রাটের আগমন ঘটলেও বাংলাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাহসী ভূমিকা ও নেতৃত্ব দান করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ভারত-পাকিস্তান দেশ বিভাগের পর থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধীরে ধীরে বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ, স্লোগান, মিটিং বাংলার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। বাংলাদেশকে করেছে স্বাধীন। বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই নির্মিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র। ইতিহাসের পুনর্পাঠ ও সিনেমাটিক রূপ মানুষের মনে করে নেয় স্থায়ী আসন। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ উপস্থাপন মানুষের মনে স্থায়ী নিবাস তৈরি করে দিতে পারে। ১৯৭২-৭৫ সালের মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কীভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, সেটা তুলে ধরা হলো।

স্লোগানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

স্লোগান খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেকোনো আন্দোলন-সংগ্রামের অন্যতম অনুষঙ্গ স্লোগান। ১৯৭২-৭৫ সালে নির্মিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রগুলোতে মিছিল ও স্লোগান রয়েছে। তবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম পাওয়া যায় *ওরা ১১ জন*, *অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী*, *আমার জন্মভূমি*, ও *সংগ্রাম* চলচ্চিত্রের স্লোগানে।
মূলত যে স্লোগানগুলো পাওয়া যায়, তার মধ্যে অন্যতম হলো 'তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব'। এই স্লোগানটির আগে-পরে বাক্য জুড়ে দিয়ে মিছিল সম্পন্ন হতো।

ওরা ১১ জন চলচ্চিত্রের ১৪ মিনিট ২৪ সেকেন্ডের সময় মিছিলের দৃশ্য দেখানো হয়। মিছিলে স্লোগান শোনা যায়, 'জয় বাংলা, জয় বাংলা। তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব'। আবার চলচ্চিত্রটির ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ৫৬ সেকেন্ডে গিয়ে 'জয় বাংলা। তোমার নেতা, আমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব। পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা। তোমার দেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ' স্লোগানের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে।

ওরা ১১ জন চলচ্চিত্রে মোট পাঁচবার মিছিল ও স্লোগানের দৃশ্য দেখানো হয়। এর মধ্যে মাত্র দুবারই স্লোগানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উচ্চারিত হয়। বাকি তিনবার যথাক্রমে চলচ্চিত্রের ২৫ মিনিট ২৮ সেকেন্ডে, ২৯ মিনিট ৫০ সেকেন্ডে এবং ১ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট ৩০ সেকেন্ডের সময় মিছিল ও স্লোগান প্রদর্শিত

হয়। কিন্তু এই সময় প্রদর্শিত স্লোগানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি।

অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী চলচ্চিত্রের শুরুতে নাম লেখা শেষ হলে একজন নারীকে দেখানো হয়। কোমরে কলসি, চুল ছেড়ে দেওয়া। দৃশ্য দেখে বোঝা যায় মেয়েটি বীরাঙ্গনা। আর ব্যাকগ্রাউন্ডে স্লোগান ভেসে আসে, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।। জয় বাংলা, জয় বাংলা'। চলচ্চিত্রের ৬ মিনিট ৩৩ সেকেন্ডে গিয়ে এই স্লোগান প্রদর্শন করা হয়। এর মিনিট তিনেক পর ৯ মিনিট ৫ সেকেন্ডে বঙ্গবন্ধুর ছবি দেখানোর সাথে সাথে স্লোগান ভেসে আসে–'জয় বাংলা, জয় বাংলা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ'। আরেকবার স্লোগানে বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করা হয়। ১ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট ৪৩ সেকেন্ডের সময় 'জয় শেখ মুজিব' বলে স্লোগান দেওয়া হয়। এর বাইরে শুধু ৪ মিনিটের সময় একবার স্লোগান প্রদর্শিত হয়। সেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে কোনো স্লোগান দেওয়া হয়নি।

আমার জন্মভূমি চলচ্চিত্রের ১ ঘণ্টা ২৪ মিনিট ৩০ সেকেন্ডের সময় মিছিল দেখানো হয়। মিছিলের স্লোগানে বলা হয় 'জয় বাংলা। জয় বাংলা। তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব'। *আমার জন্মভূমি* চলচ্চিত্রের আর কোথাও স্লোগানের সন্নিবেশ নেই। এই স্লোগানটি ব্যতীত আরও চারবার স্লোগান প্রদর্শিত হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি স্লোগানই ছিল 'জয় বাংলা'। বাকি একটি স্লোগান ছিল 'সংগ্রাম সংগ্রাম, চলবেই চলবে, জয় বাংলা'।

সংগ্রাম চলচ্চিত্র শুরু হয় মিছিল ও স্লোগান দিয়ে। 'জয় বাংলা। জয় বাংলা। তোমার দেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ। তোমার দেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ। তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব। তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব'। শেখ মুজিব নামটি প্রথম উচ্চারিত হয় চলচ্চিত্রের ২ মিনিট ১৭ সেকেন্ডে এসে। ১২ মিনিট পর ১৪ মিনিটের সময় পুনরায় 'জয় বাংলা। জয় বাংলা। জয় বাংলা। জয় বাংলা। তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব। আমার নেতা তোমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব। সব কথার শেষ কথা বাংলার স্বাধীনতা। সব কথার শেষ কথা বাংলার স্বাধীনতা। জয় বাংলা জয় বাংলা'। স্লোগানে মুখরিত হয় চলচ্চিত্র। এ ছাড়া আরও তিনবার স্লোগান প্রদর্শিত হয়।

ওরা ১১ জন চলচ্চিত্রে দুবার, *অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী* চলচ্চিত্রে তিনবার, *আমার জন্মভূমি* চলচ্চিত্রে একবার, *সংগ্রাম* চলচ্চিত্রে দুবারসহ মোট আটবার স্লোগানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উচ্চারিত হয়। চারটি চলচ্চিত্রে মোট ১৯ বার স্লোগান প্রদর্শিত হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণগুলোর মধ্যে সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধ বলতে সাতই মার্চের ভাষণকেই বোঝানো হয়। এ ভাষণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা। কিন্তু ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের মধ্যে শুধু চারটি চলচ্চিত্রে এই ভাষণ তুলে ধরা হয়। চলচ্চিত্রগুলো হলো *ওরা ১১ জন*, *অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী*, *আমার জন্মভূমি*, *সংগ্রাম*।

ওরা ১১ জন চলচ্চিত্রের ১৪ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডে প্রদর্শিত মিছিল শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের ভাষণ দেখানো হয়। ভাষণে বলা হয়, 'ভাইয়েরা আমার, তোমার আমার উপর বিশ্বাস আছে? আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। সাত কোটি মানুষকে দাবায় রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না। তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশা আল্লাহ।' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের ভাষণের ভিডিওচিত্র ৪৫ সেকেন্ড দেখানো হয়।

অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী চলচ্চিত্রের ১ ঘণ্টা ৩ মিনিট ২০ সেকেন্ডে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের ভাষণ প্রচারিত হয়। ভাষণে তুলে ধরা হয় 'আর যদি একটা গুলি চলে। আর যদি আমার লোকদের উপর হত্যা করা হয়। তোমাদের প্রতি আমার অনুরোধ রইলো, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।' ১ ঘণ্টা ৮ মিনিট ৫০ সেকেন্ডে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের ভাষণের অংশ আবারও শোনা যায়, 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশা আল্লাহ।' এই ভাষণের ব্যাকগ্রাউন্ডে চলচ্চিত্রের চরিত্র আনোয়ার হোসেন ওরেফ আনুর (চলচ্চিত্রে চলচ্চিত্র অভিনেতা হিসেবে পরিচিত) মুখমণ্ডল দেখানো হয়। চলচ্চিত্রের কাহিনি অনুযায়ী তিনি তখন মুক্তিযুদ্ধের কারণে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে অবস্থান করছিলেন।

আমার জন্মভূমি চলচ্চিত্রের ১৪ মিনিট ৫০ সেকেন্ডে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি ছবি দেখানো হয়। ছবিটি জুম আউট করা হয়। ছবি দেখানোর সময় ব্যাকগ্রাউন্ডে লক্ষ মুজিব গানের মিউজিক দেওয়া হয়। একই সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের ভাষণ ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজতে থাকে। এরপর সাতই মার্চ ভাষণের ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়। দৃশ্যে সাতই মার্চের ভাষণে উপস্থিত লক্ষ লক্ষ মানুষকে দেখানো হয়। এই ভাষণে বলা হয়, 'আর যদি একটা গুলি চলে, আর

যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর আমার অনুরোধ রইলো–প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং রাস্তাঘাট যা যা আছে, সবকিছু আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দিবে।'

সংগ্রাম চলচ্চিত্রের ৩৮ মিনিট ০৪ সেকেন্ডের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠে সাতই মার্চের ভাষণ শোনা যায়। আর ব্যাকগ্রাউন্ডে চলচ্চিত্রের চরিত্র বাঙালি মেজর হাসানের মুখমণ্ডল দেখানো হয়। আর সাউন্ডট্র্যাকে শোনা যায়, '... আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর আমাদের অনুরোধ রইলো প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।'

ওরা ১১ জন, *অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী*, *আমার জন্মভূমি*, *সংগ্রাম* এই চারটি চলচ্চিত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের ভাষণ প্রচারিত হলেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের ভাষণের ভিডিওচিত্র প্রচারিত হয় *ওরা ১১ জন* এবং *আমার জন্মভূমি* চলচ্চিত্রে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্থিরচিত্র

অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী চলচ্চিত্রের ৯ মিনিট ০৫ সেকেন্ডে গিয়ে প্রথম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্থিরচিত্র দেখানো হয়। ছবির নিচে লেখা ছিল, 'এ সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। আমার জন্মভূমি চলচ্চিত্রের ১১ মিনিট ৪০ সেকেন্ডের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি স্থিরচিত্র দেখানো হয়। ছবিটি জুম আউট করা হয়। স্থির ছবি দেখানোর সময় ব্যাকগ্রাউন্ডে লক্ষ মুজিব গানের মিউজিক দেওয়া হয়। সংগ্রাম চলচ্চিত্রের ২ ঘণ্টা ২ মিনিট ৪৪ সেকেন্ডে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখানো হয়। এই তিনটি চলচ্চিত্র ছাড়া আর কোনো চলচ্চিত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্থিরচিত্র প্রদর্শিত হয়নি।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ওরা ১১ জন চলচ্চিত্রের ২৫ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডে পাকিস্তানি অফিসার বাঙালি কর্মকর্তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার সময় বলেন, 'দয়া দয়া দয়া। দয়া কি কা জরুরত হে। জয় বাংলা করো। তোমহারা ভাই বঙ্গবন্ধু কে পাস যাও। ও তুমে খানা দেগা।' ১ ঘণ্টা ৮ মিনিট ৫৫ সেকেন্ডের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজ নিতে একটি পরিবারকে জিজ্ঞেস করে। তারা উত্তর না দিলে তাদের গুলি করে মেরে ফেলে। এরপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঘৃণার স্বরে বলে, 'জয় বাংলা বলতা হে। বঙ্গবন্ধু হে।'

রক্তাক্ত বাংলা চলচ্চিত্রে এক পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়লে বলে ওঠে, 'হে ভাই মাত মারো ভাই মাত মারো। মুজিব (৪১ মিনিট ১৩ সেকেন্ড) মেরা বাপ হে। বাঙ্গাল বহুত আচ্ছা হে। মাত মারো।'

সংগ্রাম চলচ্চিত্রের ১৫ মিনিট ১৪ সেকেন্ডের সময় পাকিস্তানি আর্মি বলে, 'ইউ আর নো শেখ মুজিব ক্যা সাথ প্রেসিডেন্ট কা কনফারেন্স, সেফ হামে বাত সামাল নে ক্যা ওয়াকত দেনে কা খেল হে।' আবার ২৬ মিনিট ০৯ সেকেন্ডে, 'ডোন্ট ওরি ফর দ্যাট। হামনে রুসকো সামাল নিয়া কিয়া পুরো ইন্তেজাম কর দিয়া। মৌলভীবাজার মে হামারা ৪১ পাঞ্জাব রেজিম্যান্ট স্টেশন হ্যা। ওর আজ তে মে উস ক্ষতম কর দে গা। মুজিব, বঙ্গবন্ধু, জয় বাংলা। হুমম...'। ৪৪ মিনিট ৩১ সেকেন্ডের সময় বলে, 'কাঁহা গিয়া তোমহারা জয় বাংলা। শালা গাদ্দার কি বাচ্চে। তোমহারা নেতাজি হামারে কাবজামে হ্যায়।'

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থান তিনটি চলচ্চিত্রে ভেসে ওঠে। এখানে দেখা যায় হানাদার বাহিনী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘৃণা ভরে দেখত। কোনো বাঙালি বিপদে পড়লে তারা বঙ্গবন্ধুর কাছে যেতে বলত। পাকিস্তানি বাহিনীর এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, বাঙালির আস্থা ও ভরসার স্থান ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাদের হাতে বন্দী এই বিষয়টি উপস্থাপন করে বাঙালিকে ভয় দেখাত পাকস্তানি বাহিনী। তবে এর উল্টোটাও দেখা যায়, পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়লে তারা মুজিবের নাম নিতে দ্বিধা করেননি। অর্থাৎ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘৃণা ভরে দেখলেও তারা এটা বিশ্বাস করত বাঙালির আস্থার স্থল ও বিপদের বন্ধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বাঙালি ও মুক্তিযোদ্ধাদের দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

আমার জন্মভূমি চলচ্চিত্রের ৪৭ মিনিট ৩৯ সেকেন্ডের সময় এক মুক্তিযোদ্ধা চরিত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন, যে আদর্শের জন্য তোমরা মরণপণ করেছ, যার আদর্শ সামনে রেখে তোমরা এগিয়ে চলেছ, তাঁর কথা এতটুকু ভেবে দেখেছ (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি প্রদর্শিত হয়)। আদর্শের জন্য তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন। জেল-জুলুম তাঁকে এতটুকু টলাতে পারেনি (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি প্রদর্শন শেষ)। চলচ্চিত্রের সান্ত্বনা চরিত্র বলেন, কিন্তু মানুষের ভালোবাসা তাঁকে অস্থির করে তোলে।

সংগ্রাম চলচ্চিত্রের চরিত্র মেজর হাসানের কণ্ঠে, ইয়েস এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। বন্ধুগণ পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। শেখ

সাহেব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন।

বাঙালি ও মুক্তিযোদ্ধাদের দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে মাত্র দুটি চলচ্চিত্রে। অন্য চলচ্চিত্রগুলোতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপস্থাপন থাকলেও বাঙালি ও মুক্তিযোদ্ধা চরিত্রের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে কোনো বক্তব্য উপস্থাপিত হয়নি। *আমার জন্মভূমি* চলচ্চিত্রে বঙ্গবন্ধুকে আদর্শের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর আত্মত্যাগের বিষয়টিও উঠে আসে বাঙালি ও মুক্তিযোদ্ধাদের দৃষ্টিতে। স্বাধীনতার ঘোষণার প্রতীক হিসেবেও বঙ্গবন্ধুকে দেখানো হয় এই চলচ্চিত্রে।

চলচ্চিত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরোক্ষ উপস্থাপন

রক্তাক্ত বাংলা চলচ্চিত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুকরণে একজনকে ভাষণ দিতে দেখা যায়। যিনি বঙ্গবন্ধুর প্রতিচ্ছবি। আবার *আলোর মিছিল* চলচ্চিত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে একটি দৃশ্যে রূপকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ১ ঘণ্টা ৩১ মিনিট ২৬ সেকেন্ডে বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণকে অনুকরণ করে চরিত্র শহীদ, রানাসহ অন্য মুক্তিযোদ্ধারা দেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে বলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের বাঁচার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম।'

উপসংহার

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ব্যতীত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সূর্য উদিত হতো না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাহসিকতা, তাঁর নেতৃত্বে বাংলার মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বাধীনতাযুদ্ধে। সাতই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে দেওয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলার মানুষ ২৬ মার্চ ১৯৭১ স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অর্জিত হয় বাংলার মানুষের স্বাধীনতা। বিনিময়ে দিতে হয় প্রাণ, মা-বোনের ইজ্জত। বাংলার স্বাধীনতাযুদ্ধ ফ্রেমবন্দী হয়েছে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রে। কিন্তু সেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কীভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, এই প্রশ্ন থেকে বর্তমান প্রবন্ধের সূচনা। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের সময়কাল ধরে নেওয়া হয় ১৯৭২-৭৫ সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনকালে যে কয়টি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছে, সেই চলচ্চিত্রগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বারোটি চলচ্চিত্রের মধ্যে পাঁচটি চলচ্চিত্র পাওয়া যায়নি। এ কারণে *জীবন থেকে নেয়া*, *ওরা ১১ জন*, *রক্তাক্ত বাংলা*, *অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী*, *আমার জন্মভূমি*, *আলোর মিছিল*, *সংগ্রাম* এই সাতটি চলচ্চিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চলচ্চিত্রগুলোর গুণগত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, স্বাধীনতার ঘোষণা, স্লোগান, ভাষণ, ছবি, পাকিস্তানি বাহিনীর দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু,

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

বাঙালি ও মুক্তিযোদ্ধাদের দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু এবং চলচ্চিত্রে বঙ্গবন্ধুর পরোক্ষ উপস্থাপন পাওয়া গেছে। এখানে দেখা যায়, স্বাধীনতার ঘোষণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলেও অধিকাংশ চলচ্চিত্রেই ঘোষণার উপস্থিতি ছিল না। শুধু রক্তাক্ত বাংলা চলচ্চিত্রে স্বাধীনতার ঘোষণার উপস্থিতি দেখা যায়। তবে স্লোগান ও বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ *রক্তাক্ত বাংলা* ও *আলোর মিছিল* চলচ্চিত্র বাদে সব চলচ্চিত্রেই উপস্থাপন করা হয়েছে। পাকিস্তানি বাহিনীর দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গবন্ধুর ছবি দেখা যায় তিনটি চলচ্চিত্রে। *আমার জন্মভূমি* এবং *সংগ্রাম* চলচ্চিত্রে বাঙালি ও মুক্তিযোদ্ধাদের দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাওয়া যায়। পরোক্ষ উপস্থাপন পাওয়া যায় *রক্তাক্ত বাংলা* এবং *আলোর মিছিল* চলচ্চিত্রে। সর্বোপরি, চলচ্চিত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখা যায় বাংলার মানুষের আস্থার প্রতীক হিসেবে। তিনি বাংলার মুক্তিকামী মানুষের দিকনির্দেশক ছিলেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঘৃণা ভরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখলেও তারা জানত তিনি বাঙালির বিপদের বন্ধু। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার মুক্তিকামী মানুষের আদর্শের প্রতীক।

তথ্যসূত্র

১. আলমগীর, শাহ মো. ২০১৪, সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : প্রথম খণ্ড, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা

২. ইসলাম, আহমেদ আমিনুল ২০০৮, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর্থসামাজিক পটভূমি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৩. গায়েন, কাবেরী ২০১৩, মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণ, বেঙ্গল পাবলিকেশনস, ঢাকা

৪. চৌধুরী, গোলাম আকবর ২০০১, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন স্বাধীনতা ও আজকের বাংলাদেশ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

৫. রশীদ, হারুন-অর ২০১৫, বাংলাপিডিয়া, Retrieved from: http://bn.banglapedia.org/index.php?title=রহমান,-বঙ্গবন্ধু-শেখ-মুজিবুর, on 02 September 2018

৬. সাত্তার, আলমগীর ১৯৯৭, সত্তায় বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

৭. সুলতান, আমিনুর রহমান ২০১০, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা

৮. হাসান, খন্দকার মাহমুদুল ২০০৬, চলচ্চিত্র, ঐতিহ্য, ঢাকা

৯. হোসেন, আমির ২০১৩, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা

লেখক পরিচিতি

শুভ কর্মকার : প্রভাষক, প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

লেখা পাঠানো সংক্রান্ত তথ্য

লেখা গবেষণামূলক ও শিল্পমানসমৃদ্ধ হতে হবে। পূর্বে প্রকাশিত রচনা পত্রিকায় প্রকাশের জন্য গৃহীত হবে না। লেখা অনধিক ৫,০০০ শব্দের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসরণপূর্বক সুতনি এমজে ফ্রন্টে ডাবল স্পেস-এ কম্পোজ করতে হবে। ই-মেইলে bctibd2013@gmail.com ঠিকানায় অথবা সফট কপি (CD Form) এবং হার্ড কপি ডাক মারফৎ বা সরাসরি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে পাঠানো যাবে। সঙ্গে লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ঠিকানা, ই-মেইল ও ফোন নম্বর পাঠাতে হবে। প্রাপ্ত লেখা প্রাথমিক মনোনয়ন এবং বিশেষজ্ঞের মূল্যায়ন (রিভিউ) শেষে সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত ও জার্নালে মুদ্রিত হলে লেখককে নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট পত্রিকায় প্রকাশিত সকল লেখার স্বত্বাধিকারী হবে।

লেখার শেষে গ্রন্থপঞ্জি এবং লেখার মধ্যে রেফারেন্স ও টীকা প্রদানের নমুনা নিম্নরূপ:

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি লেখার শেষে উল্লেখ করতে হবে। বইয়ের ক্ষেত্রে লেখকের নাম (প্রকাশের সাল), গ্রন্থের নাম, প্রকাশনা সংখ্যা, প্রকাশের স্থান উল্লেখ করতে হবে। জার্নাল, সাময়িকী, জার্নাল বা সম্পাদিত গ্রন্থের নাম, প্রকাশনা সংস্থা, প্রকাশের স্থান উল্লেখ করতে হবে। নমুনা:

১. আল দীন, সেলিম (১৯৯৬), মধ্যযুগের বাঙলা নাটক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

২. চৌধুরী, সুচরিত (২০০৬), 'সেদিনের ছবির কথা', মুহম্মদ খসরু (সম্পাদিত), ধ্রুপদী, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ, ঢাকা।

৩. চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে – পরিচালকের নাম, *ছবির নাম* (মুক্তির সন), ফরমেট, যে দেশে চলচ্চিত্রটি নির্মিত।

৪. ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে ওয়েব ঠিকানা দিতে হবে।

রেফারেন্স

লেখার মাঝখানে রেফারেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে ব্রাকেটের মধ্যে (লেখকের সংক্ষিপ্ত নাম, প্রকাশের সাল: পৃষ্ঠা সংখ্যা) উল্লেখ করতে হবে। নমুনা:

... অরণ্যের দিনরাত্রি-কেও কখনো সত্যজিতের রাজনৈতিক ট্রিলজির অংশ ভাবা হয়েছে। কলকাতা-ত্রয়ীর ছবিগুলির মতো এখানেও সত্যজিৎ সমকালীনতার অসঙ্গতিগুলি প্রকাশ করেছেন এবং মানবচরিত্র বিশেষভাবে পুনর্মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ও ছবিই তাঁর প্রথম পদক্ষেপ। কাঞ্চনজঙ্ঘা-কে সত্যজিৎ তাঁর পরবর্তীকালের

অধিকতর রাজনৈতিক চলচ্চিত্রসমূহের পথপ্রদর্শক হিসেবেই বর্ণনা করেছে (টমসেন, ১৯৭২-৭৩: ৩২)।

টীকা

লেখার মধ্যখানে ফুটনোট অথবা টীকা প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থানে ওপরের দিকে নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করে পৃষ্ঠার শেষে টীকা বা ফুটনোট সংযোজন করতে হবে। নমুনা:

'সর্বভারতীয়' সিনেমা হিসেবে হিন্দি সিনেমার নব নির্মাণ সে প্রকল্পেরই সম্প্রসারণ।[১] পাশাপাশি অন্যান্য ভাষায় তৈরি ছবির কপালে জুটল আঞ্চলিক তকমা। ... বলা বাহুল্য, এ এক ধরনের সাংস্কৃতিক ফ্যাসিবাদ, যা স্বাধীনতা-পরবর্তী নয়া উপনিবেশবাদী প্রকল্পের অংশ।[২]

---

১ অবশ্য এসবের ক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছিল অনেক আগে থেকেই। ১৯৩৯ সালে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান মোশন পিকচার কংগ্রেস-এ একটি প্রস্তাবে চলচ্চিত্র প্রযোজকদের কাছে অনুরোধ জানানো হল হিন্দুস্তানি ভাষার প্রসারের স্বার্থে তাঁরা যেন অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় ছবি তৈরি করা বন্ধ করেন। ... তখন এটি ছিল তাঁদের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক প্রকল্পেরই অংশ। স্বাধীনতার পরে সেটিই অন্তর্ভুক্ত হল জাতীয় পুনর্গঠন প্রকল্পে।

২ উপনিবেশবাদের ধ্রুপদী প্রকল্পে একটি রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের বাণিজ্য সহযোগীরা অন্য একটি ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু আঠারো, ঊনিশ আর বিশ ... রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু তারপরেও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক প্রভুত্ব অক্ষুণ্ন থাকে। এমনকি প্রাক্তন উপনিবেশগুলিতে সহযোগী রাজনৈতিক অথবা ক্ষেত্রবিশেষে জনগোষ্ঠীর সাহায্যে তাদের রাজনৈতিক প্রভাবও নিতান্ত কম থাকে না।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট
প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

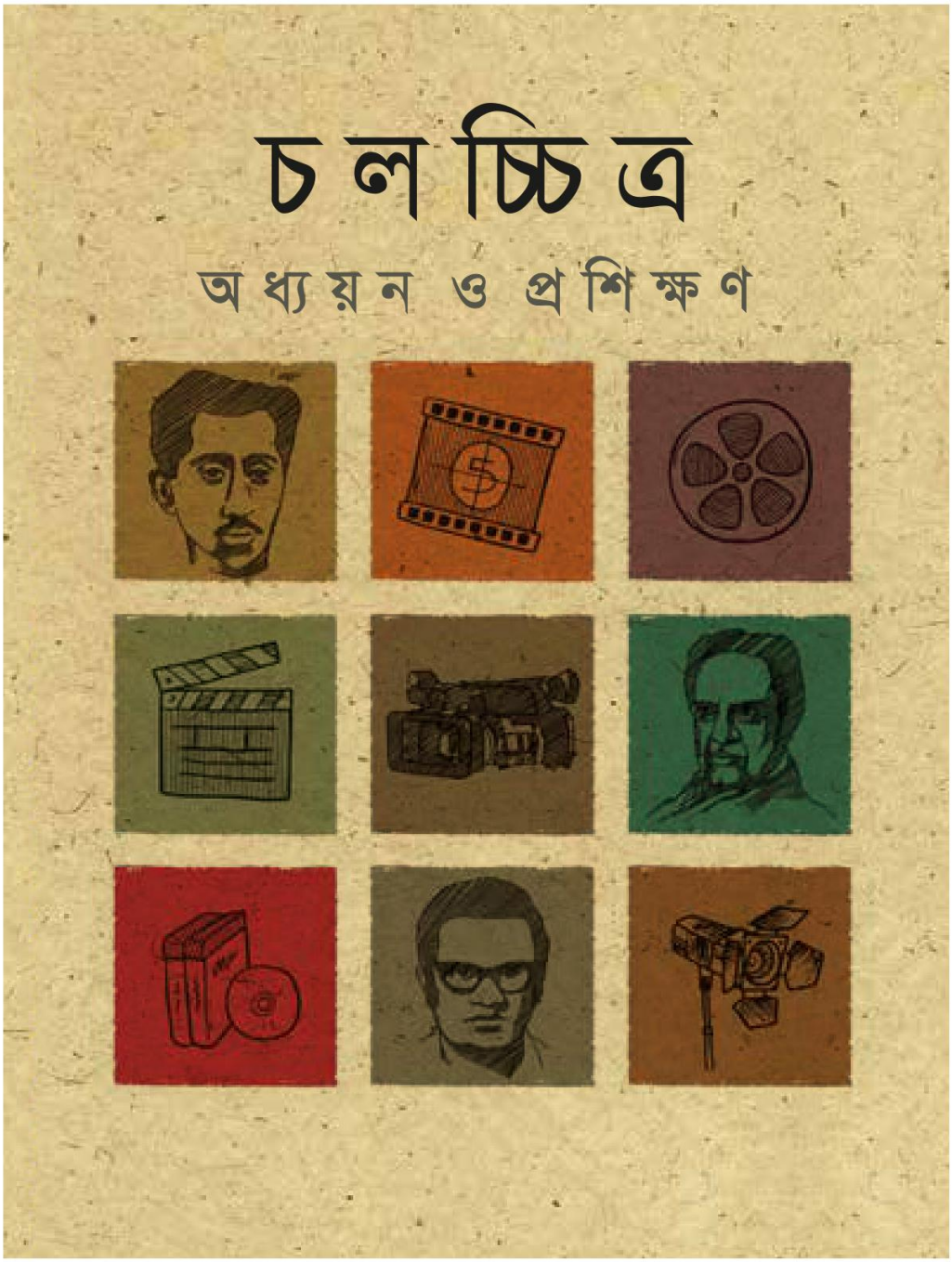

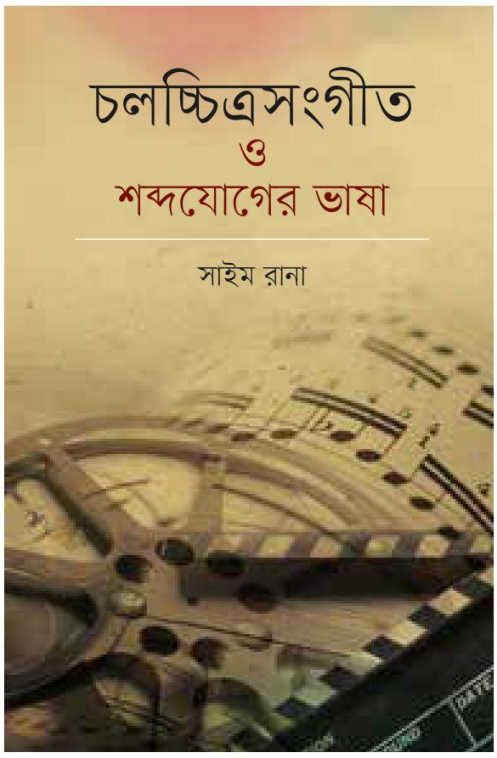
চলচ্চিত্রসংগীত
ও
শব্দযোগের ভাষা
সাইম রানা

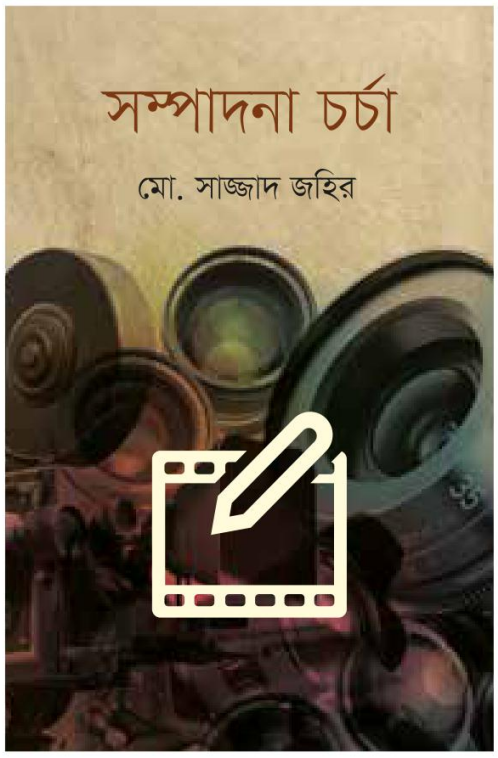
সম্পাদনা চর্চা
মো. সাজ্জাদ জহির

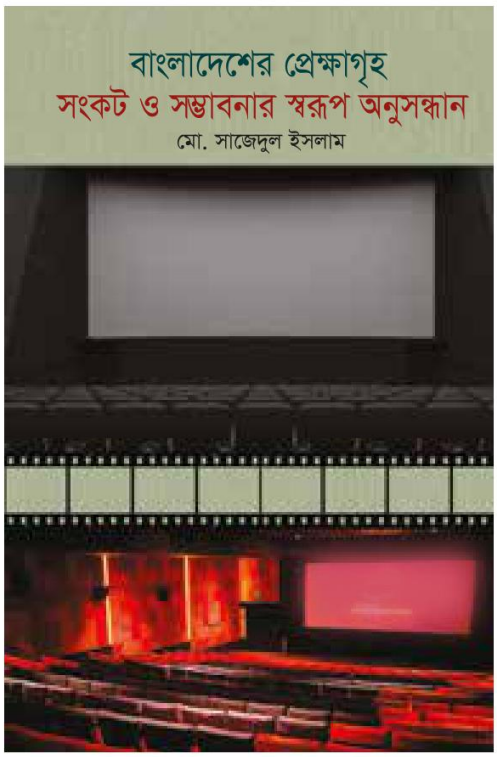
বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহ
সংকট ও সম্ভাবনার স্বরূপ অনুসন্ধান
মো. সাজেদুল ইসলাম

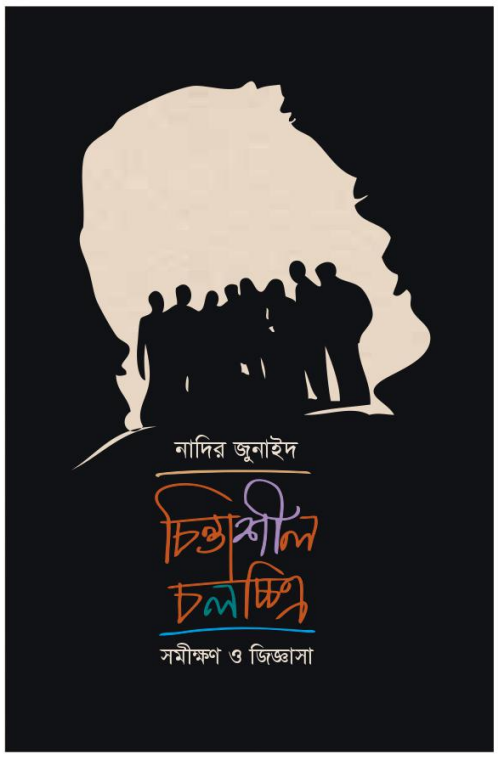
নাদির জুনাইদ
চিন্তাশীল চলচ্চিত্র
সমীক্ষণ ও জিজ্ঞাসা

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও
টেলিভিশন ইনস্টিটিউট

১২৫/এ দারুস সালাম, এ. ডব্লিউ. চৌধুরী রোড, ঢাকা-১২১৬)
ফোন: +৮৮ ০২ ৫৫০৭৯৩৪০, ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৫৫ ০৭ ৯৩ ৪৫
ই-মেইল: bctibd2013@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.bcti.gov.bd